ইসলাম ও চরমপন্থা

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

মাওলানা শামাউন আলী
অনূদিত

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স

ইসলাম ও চরমপন্থা

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স

ইসলাম ও চরমপন্থা

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ

মাওলানা শামাউন আলী

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স

মগবাজার, ঢাকা

ইসলাম ও চরমপন্থা
মূল
ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ
মাওলানা শামাউন আলী
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

প্রকাশনায়
আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
যোগাযোগ : ০৩৭৭২০১৬২৯২
০১৭১৪০১৫৯৭৭
০১৬৭২৬৯২১০০

এফ.পি-২৪

প্রকাশকাল
অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ সাল
জিলহজ্ব, ১৪৩০ হিজরী
নভেম্বর, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

মূল্য : ৫৫.০০ টাকা মাত্র।

কম্পোজ ও মুদ্রণ
নাবিল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মগবাজার, ঢাকা।

الإسـلام والعنـف
إعداد : د. يوسف القرضاوى
الترجمة باللغة البنغالية: محمد شمعون على
متخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الناشر : الفرقان للطباعة والترجمة والنشر
٤٩١، برامغبازار، داكا، بنغلاديش
تلفون : ٠٣٧٧٢٠١٦٢٩٢، ٠١٦٧٢٦٩٢١٠٠
القيمة : ٥٥ تاكا فقط
الطبعة الأولى : ذى القعدة ١٤٣٠ هـ
نوفمبر ٢٠٠٩م

ISLAM O CHARAMPANTHA (Islam and Extremism)
by Dr. Yousuf Al-Qarzavi, Translated by Maulana Shamaun Ali
Published by Al-Furkan Publication, 491 Wireless Railgate, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh. Tel: 03772016292, 01672692100
Fax : 8312997, 1st Edition: November 2009, Price : Tk. 55.00 Only.

অনুবাদকের কথা

ইসলাম মানে শান্তি। শান্তির ধর্ম ইসলাম। ইসলাম এসেছে মানবতার মুক্তির জন্য। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এসেছেন শান্তির বার্তা নিয়ে। জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকার দূর করে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁরা কাজ করেছেন। বাতিল শক্তি সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচারে সর্বাত্মক বাধা দিয়েছে। নবী-রাসূল থেকে শুরু করে ইসলামের দায়ীদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কদর্য বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমানে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে চরমপন্থী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এসব কতটুকু সঠিক? প্রকৃতপক্ষে কারা চরমপন্থী? আমাদের এই শান্তির পৃথিবীতে কারা অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে? এ বিষয়ে বর্তমান বিশ্বের খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ ড. ইউসুফ আর-কারযাভী তাঁর জ্ঞানগর্ভ লেখা الإسلام والعنف। বইটিতে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা তুলে ধরেছেন। বাংলাভাষাভাষি ভাইবোনদের জন্য সেটিকে আমরা "ইসলাম ও চরমপন্থা" শিরোনামে উপস্থাপন করলাম।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চরমপন্থা সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকা সঠিক তথ্য অবগত হয়ে নিজেদের ভূমিকার ব্যাপারে সচেতন হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বর্তমান মুসলিম বিশ্বের একজন খ্যাতিমান চিন্তাবিদ। মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি ইস্যুতে এক সোচ্চার ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এবং বহু ইসলামী গ্রন্থের প্রণেতা। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই ইউসুফ আল-কারযাভী অত্যন্ত মেধার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর বয়স দশ বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ

সম্পন্ন করেন। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী মিসরে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, আলজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষ করে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইন অনুষদ ও স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ডীন হিসেবে। তিনি বর্তমানে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সুন্নাহ ও সীরাতে রাসূল (সা.) গবেষণা সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর হিসেবে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন।

তিনি অনেকগুলো আন্তর্জাতিক দাওয়াহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। ইসলামী দাওয়াত ও শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি লেখনির ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অতুলনীয়। তাঁর অনেকগুলো বই ইতোমধ্যে বাংলাভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো- 'জেরুজালেম বিশ্বমুসলিম সমস্যা', 'ইসলামের দৃষ্টিতে কাঙ্খিত পরিবার', 'ইসলামের যাকাত বিধান', 'দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম' এবং ইসলামে ইবাদতের পরিধি।

বইটির অনুবাদ ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ আমাদের এ খিদমত কবুল করুন। আমীন॥

মগবাজার, ঢাকা বিনীত

২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ সাল মুহাম্মদ শামাউন আলী

সূচিপত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী-রাসূলগণের উপর যাদেরকে বিশ্বমানবতার হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের উপর এবং যারা তাঁর অনুসরণ করবে তাদের উপর। অতঃপর–

আমি এখানে চরমপন্থা সম্পর্কে কিছু লেখা উপস্থাপন করছি এবং এ সম্পর্কে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থান তুলে ধরছি। বিষয়টি আজ সবার নিকট বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, বিষয়টি নিয়ে গোটা দুনিয়াতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। এর দ্বারা শুধু মুসলমানদেরকেই অভিযুক্ত করা হয়নি বরং ইসলামকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে- ইসলাম এমন এক ধর্ম যার চিন্তাধারা ও কর্মে চরমপন্থা লালন করা হয়ে থাকে- আল্লাহর ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু করে, তাঁর উপর দৃঢ়বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে তিনি (আল্লাহ) হলেন অদ্বিতীয়, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, মহাক্ষমতাধর; ইসলাম তার অনুসারীদের উপর জিহাদ ফরয করেছে যেন তারা আল্লাহর পথে যথার্থভাবে জিহাদ করে।

আমি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে চেয়েছি তাদের জন্য যারা এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল নয় এবং যারা অবগত তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আর যত অপবাদ দেয়া হয়েছে তার জবাব দিতে চেয়েছি এবং এই মহান দীন সম্পর্কে যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা হচ্ছে তা অপনোদন করতে চেয়েছি, যাকে এর কিছু নির্বোধ অনুসারী কলুষিত করেছে তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে। প্রাচীন কালের প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে– 'জ্ঞানী শত্রু বোকা বন্ধুর চেয়ে উত্তম!'

আশা করি এর দ্বারা মনের ব্যথা-বেদনা কিছুটা হলেও দূর হবে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত "ফিকহুল জিহাদ" নামক বইয়ে আলোচনা করবো বলে আশা করছি। মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করছি, তিনি যেন বিষয়টি

পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করার তওফীক দান করেন।

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا۔ (الكهف : ١٠)

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকাণ্ড সঠিক করে দিন।" (সূরা কাহাফ ঃ ১০)

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔ (التحريم : ٨)

"হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।" (সূরা তাহরীম ঃ ৮)

আর আমাদের সর্বশেষ ঘোষণা হল- সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য।

দোহা, কাতার
সেপ্টেম্বর, ২০০৪ ইং

মহান আল্লাহর করুণাপ্রার্থী
ইউসুফ আল-কারযাভী

ইসলাম ও চরমপন্থা

চরমপন্থা (العنف) শব্দের আভিধানিক অর্থ

আল-কামুস নামক অভিধানে বলা হয়েছে- নম্রতা-দয়াশীলতার বিপরীত হল চরমপন্থা।

চরমপন্থা শব্দটি দ্বারা কাঠিন্যতা ও রুঢ়তাও বুঝানো হয়ে থাকে।

কতিপয় হাদীসে নম্রতা-দয়াশীলতার বিপরীতে চরমপন্থা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ -

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ নম্র, তিনি নম্রতা-দয়াশীলতাকে পছন্দ করেন। আর তিনি নম্রতা-দয়াশীলতার দ্বারা যা দিয়ে থাকেন চরমপন্থার মাধ্যমে তা দেন না।"[১]

নবী করীম (সা.) নম্রতা-ভদ্রতাকে পছন্দ করতেন এবং বাড়াবাড়ি, চরমপন্থা ও কাঠিন্যতাকে ঘৃণা করতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে প্রতিটি বিষয়ে নম্রতা গ্রহণ করতে বলতেন।

আয়েশা (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ -

"কোন বিষয়ের মাঝে নম্রতা-দয়াশীলতা থাকলে তাকে অবশ্যই সৌন্দর্যমন্ডিত করবে। আর কোন বিষয় থেকে তা (নম্রতা-দয়াশীলতা) ছিনিয়ে নিলে তাকে অবশ্যই কদর্য ও কলুষিত করে দেবে।"[২]

---

১. মুসলিম, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হাদীস নং ২৫৯৩

২. মুসলিম, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হাদীস নং ২৫৯৪

নবী করীম (সা.) আরো ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَاِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقَ ، مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُحْرَمُوْنَ الرِّفْقَ اِلاَّ حُرِمُوا الْخَيْرَ۔

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ নম্রতা-দয়াশীলতার দ্বারা যা দিয়ে থাকেন চরমপন্থার মাধ্যমে তা দেন না। আর আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে নম্রতা-দয়াশীলতা দান করেন। কোন পরিবারের লোকজন যদি নম্রতা-দয়াশীলতা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তারা সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হল।"[১]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই শব্দটির মূল (ع ن ف) কুরআন মজীদের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি- না মাসদার (মূল ধাতু) হিসেবে, না ক্রিয়া হিসেবে আর না বিশেষণ হিসেবে।

চরমপন্থা শব্দটির বর্তমান পরিভাষায় অর্থ

বর্তমানে চরমপন্থা (العنف) শব্দটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এটি একটি ধিকৃত ও অপরাধমূলক পরিভাষা বলে চিহ্নিত হয়েছে। এটি অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করেছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পিতামাতা ও সন্তানদের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পরিবারের কর্তা-কর্ত্রী ও চাকর-বাকরদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে- মালিক ও শ্রমিকদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সাধারণভাবে শক্তিমান ও দুর্বলদের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে- শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে- অপরাধীদেরকে শাস্তিদানের ক্ষেত্রে যেমনটি কতিপয় পশ্চিমা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ও শাস্তি বিধানকে চরমপন্থা ও বর্বরতা বলে অভিহিত করে থাকে।

এটি আমাদের বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। আর চরমপন্থা বলতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রকেই

সাধারণত বুঝানো হয়ে থাকে। এর প্রতি ঘৃণার বাণী উচ্চকিত হচ্ছে এবং অতিসম্প্রতি এটিকে নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হচ্ছে, যদিও নির্দিষ্ট করা হয়নি কে এটি শুরু করেছে আর কারা এই অপরাধের সাথে জড়িত।

চরমপন্থার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অভিযুক্ত করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে। আর পশ্চিমারাই তাদেরকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত করছে– কিন্তু বাস্তবতা বলছে: পশ্চিমারাই হল সবচেয়ে বেশী চরমপন্থী, আর গোটা দুনিয়ায় মুসলমানরাই চরমপন্থার শিকার। সর্বত্রই তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠিত হচ্ছে।

আমরা এখানে রাজনৈতিক চরমপন্থা এবং এ ব্যাপারে মুসলমানদের অবস্থান কি? সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

চরমপন্থা বলতে রাজনৈতিক অঙ্গনে কি বুঝায় যা আজকে খুবই ঘৃণিত ও অপরাধমূলক কাজ?

মুসলমানদেরকে চরমপন্থী বলে অভিযুক্ত করাটা কি সঠিক? যদি সঠিক হয়, তাহলে কি ইসলাম তাদেরকে চরমপন্থা গ্রহণ করতে বলেছে?

তাহলে আসুন আমরা এখন চরমপন্থা সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করি।

চরমপন্থা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা হল- বিরুদ্ধবাদীকে দমন করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা বা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বিরুদ্ধবাদীকে নির্মূল করা কোন রকমের আইন-কানুন বা নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে। এর ফলে নিরপরাধ ও বেসামরিক লোকদের ভাগ্যে কি ঘটবে সেদিকে মোটেই দৃষ্টিপাত না করা। এই চরমপন্থা ব্যক্তির পক্ষ থেকে হতে পারে বা কোন গোষ্ঠী কিংবা দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে অথবা কোন সরকারের পক্ষ হতেও ঘটতে পারে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু দলকে চরমপন্থী হিসেবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, অথচ তারা এ ব্যাপারে নির্দোষ, চরমপন্থা থেকে তারা মুক্ত।

আমার দৃষ্টিতে চরমপন্থা না হয়ে শক্তির ব্যবহার বা অহেতুক কঠোরতা অবলম্বন করা কিংবা সময়ের পূর্বের শক্তির ব্যবহার করা বা কোন রকমের নিয়মনীতি না মেনে শক্তির অপপ্রয়োগ করাকে বললেই ভাল হয়।

আমি বলছি, কাঠিন্যতা, আমি বলছি না- শক্তির ব্যবহার, যেমনটি আজকে অনেকেই মনে করেন।

কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে 'চরমপন্থা' শুধুমাত্র শক্তির প্রয়োগ বা সামরিক শক্তির ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং চরমপন্থা ঝগড়া-বিবাদ ও বাক-বিতণ্ডাকেও শামিল করে।

কারণ ব্যতিরেকে চরমপন্থাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে, সেটি কথা বা কাজ যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন।

এ জন্যই ইসলামী দাওয়াতের নীতিমালা নম্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, চরমপন্থা বা কাঠিন্যতার উপরে নয়। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

أُدْعُ إِلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ - (النحل : ١٢٥)

"তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর।" (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

তিনি অন্যত্র বলেনঃ

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُ الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا - (الإسراء : ٥٣)

"আর আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন এমন কথা বলে যা অতি সুন্দর। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু।" (সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৫৩)

মহান আল্লাহ্ তাঁর মুমিন বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন অন্যদেরকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্যে সতর্কতা অবলম্বন করে, তারা যেন উত্তম বাক্য ব্যবহার করে শুধুমাত্র ভাল কথাই নয়। যদি দুটি বাক্য থাকে একটি ভাল এবং অপরটি উত্তম; তাহলে তাঁর বান্দাদের উপর নির্দেশ হল- উত্তম বাক্যটি ব্যবহার করার।

এভাবেই একজন মুসলমান সতর্ক থাকবে তার বক্তব্যে, ঝগড়া-বিবাদে উত্তম বাক্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এবং অন্যকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ - (حم السجدة : ٣٤)

"আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর।" (সূরা হা-মিম সিজদা ঃ ৩৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন উক্ত আদর্শের প্রকৃষ্ট নমুনা যা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর চরিত্রটিই ছিল কুরআনী চরিত্র। বুখারী শরীফে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ইহুদীদের কতিপয় লোক রাসূল (সা.)-এর নিকট সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তিনি তাদের আসার অনুমতি দেন। তারা তাঁকে এই বলে অভিবাদন করে- আস্সামু আলাইকা (اَلسَّامُ عَلَيْكَ) [অর্থাৎ আপনার মৃত্যু ও ধ্বংস হোক।] আমি তখন বলি- বালিস্ সামু আলাইকুম ওয়াল্লানা' (بَلِ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَاللَّعْنَةُ) [বরং তোমাদের মৃত্যু ও ধ্বংস হোক এবং তোমাদের উপর অভিসম্পাত।] তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, তারা কি বলেছে তা কি আপনি শুনেন নি? তিনি বললেন, আমি এর জবাবে বলেছি- ওয়া আলাইকুম অর্থাৎ সেটি তোমাদের উপরও।[১]

এই কদর্য ইহুদীরা নবীর সাথে সম্বোধনের শিষ্টাচার রক্ষা করেনি। রবং তারা নিজেদের জিহ্বাকে বক্র করেছে, বাক্যাবলীকে বিকৃত করেছে, হে মুহাম্মাদ! আস্সালামু আলাইকা না বলে, আস্সামু আলাইকা বলেছে। কিন্তু রাসূল (সা.) এ নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে না দিয়ে তিনি জবাব দিয়েছেন- ওয়া আলাইকুম (আর তা তোমাদের উপরও) বলে। অর্থাৎ

---

১. বুখারী, আদাব অধ্যায়, হাদীস নং ৬০২৪; মুসলিম, সালাম অধ্যায়, হাদীস নং ২১৬৫

তোমাদের ও আমাদের সবার উপর মৃত্যু ও ধ্বংস। তিনি তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ নস্পন্ন যুবতী স্ত্রীকে প্রতিটি বিষয়ে নম্রতা গ্রহণের শিক্ষা দিলেন।

ইসলাম যখন আলাপচারিতা ও কথাবার্তায় চরমপন্থা ও বাড়াবাড়িকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাহলে কর্মকান্ডের ক্ষেত্রেও চরমপন্থা ও কঠোরতাকে প্রত্যাখ্যান করবে এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ অহেতুক শক্তির ব্যবহার ও সামরিক শক্তির প্রয়োগকে প্রত্যাখান করেছে- তা সত্য-ন্যায়ের পথেই হোক বা বাতিলের ক্ষেত্রে এবং জুলুম ও ইনসাফ যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন।

জাহেলী যুগে আরবদের মাঝে চরমপন্থা

জাহেলী যুগে আরবরা রুঢ়তা, বর্বরতা ও নির্দয় চরিত্রের প্রশংসা করত, দয়াপরবশ ও ন্যায়নীতি পরায়ণ চরিত্রকে নয়। আপনি কি চিন্তা করতে পারেন? তাদের কেউ কেউ নিজের সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা করেছে। বিশেষ করে তারা মেয়ে সন্তানকে দারিদ্র ও আত্মমর্যাদার কারণে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম পন্থায় জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করত। মহান আল্লাহ তাদের এই জঘন্য অপকর্মকে এভাবে তুলে ধরেছেনঃ

وَاِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ - بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ - (التكوير : ٨-٩)

"আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।" (সূরা তাকভীর ঃ ৮-৯)

কবি জুহাইর বিন আবী সালমা তার মুয়াল্লাকায় বলেনঃ

যে ব্যক্তি তার অস্ত্র দ্বারা পানির হাউজ থেকে অন্যদেরকে না তাড়াবে

অচিরেই তার হাউজ নষ্ট হয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তি মানুষের উপর জুলুম না করবে,

সে অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হবে।

কবি এখানে মানুষকে উৎসাহিত করেছে জুলুম করার জন্য যেন তারা

নিজেরাই জুলুম শুরু করে তাহলে তারা জুলুমের শিকার হবে না। যেমনটি অপর এক ব্যক্তি বলেছিল, "তুমি তোমার শত্রু দ্বারা দুপুরের খানা খাও, সে তোমাকে দিয়ে রাতের খানা খাবার পূর্বেই।"

অপর এক জাহেলী কবি আমর ইবনে কুলসুম বলেন,

দুনিয়াতো আমাদের জন্যই, আর যারা গতকাল ছিল
আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালাবো সর্বশক্তি দিয়ে।
আমরা হবো দুর্দান্ত জালেম, আমরা জুলুমের শিকার হবো না
আমরাই প্রথমে জুলুম শুরু করবো জালিম হিসেবে।

তিনি আরো বলেন,

আমরা কোন পানির ঘাটে গেলে পরিচ্ছন্ন পানি পান করবো
আর অন্যরা পান করবে ঘোলা ও কর্দমাক্ত পানি।

এ ধরনের চরিত্রের প্রসার লাভে তাদেরকে সহায়তা করত অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্রপ্রীতি। এ কারণে মানুষ তার স্বগোত্রীয় লোকজনকে সে সঠিক বা বাতিল যা-ই হোক না কেন, তাকে সাহায্য করত, একথার বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর- "তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে জালিম হোক বা মাজলুম।"

তারা তাদের ভাইকে জিজ্ঞেস করে না যখন
তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করে।
কোন বিপদাপদে যে, তুমি কি কারণে
আমাদের সাহায্য চাও- প্রমাণ দাও।

তাদের কোন এক দলনেতা বলে, সে যখন ক্রোধান্বিত হয়: তার সাথে একহাজার তরবারী ক্রোধান্বিত হয়, তাকে জিজ্ঞেস করে না- কেন ক্রোধান্বিত হয়েছো?

যখন তাদেরকে মহান আল্লাহ ইসলামের দ্বারা ধন্য করলেন, তাদেরকে এক নতুন চরিত্রে গড়ে তুললেন, তাদের আকিদা-বিশ্বাস এবং চিন্তাধারায়

পরিবর্তন সাধন করলেন, তাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটালেন। তাদেরকে সঠিক চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত করে চরিত্রকে সংশোধন করলেন যেন তারা মানবতার সামনে সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হয় যদিও তা নিজেদের জীবনের উপর বা সন্তান-সন্ততি কিংবা নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে হয়ে থাকে। তাদেরকে গোত্রপ্রীতি বা ক্রোধ সত্য-ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তারা হকের সাথেই হকের জন্য ছুটেছে। তারা তরবারী হাতে নিয়েছে একমাত্র সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই বা বাতিলকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে কিংবা ইনসাফ কায়েমের জন্যে অথবা মাজলুমকে সাহায্য করার নিমিত্তে।

নবী করীম (সা.) তাদের সামনে "তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালেম হোক বা মাজলুম হোক।" বাক্যের নতুন ব্যাখ্যা তুলে ধরলেন- তাকে জুলুম থেকে বাধা দিবে, সেটিই তাকে সাহায্য করা হবে।

ইসলাম জাহেলিয়াতের যুদ্ধ-বিগ্রহকে নিষিদ্ধ করে এবং মুসলমানদেরকে আহ্বান করে তারা যেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়। তারা সকলেই যেন সত্যের নিকট মস্তক অবনত করে, যুদ্ধের উপর শান্তিকে প্রাধান্য দেয় এবং রাগের উপর ক্ষমা ও মার্জনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে।

এরা শক্তির আশ্রয় একমাত্র তখন গ্রহণ করে যখন শত্রুতা ও আক্রমণ প্রতিহত করার আর কোন পথ থাকে না কিংবা দীনের ব্যাপারে কোন ফিতনা দূর করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে বা দুর্বল-অসহায়দেরকে মুক্ত করার প্রয়োজন পড়ে কিংবা এধরনের কোন বিশেষ প্রয়োজনেই তারা শক্তি প্রয়োগে এগিয়ে আসে। তারা নিরুপায় হয়েই যুদ্ধে জড়ায়। যেমনটি মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ - (البقرة : ٢١٦)

"তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান ফরজ করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)

কিন্তু যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে লড়াই ব্যতিরেকেই যেমনটি ঘটেছিল

খন্দকের যুদ্ধে। তখন সে সম্পর্কে কুরআন মজীদে এভাবে ব্যক্ত করা হলঃ

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ط وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ط وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ـ (الأحزاب : ٢٥)

"আল্লাহ্ কাফিরদেরকে তাদের আক্রোশসহ ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা আহ্যাব ঃ ২৫)

কত সুন্দর বক্তব্য ও ভাষা যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় ইসলাম সন্ধির ব্যাপারে কতটা আগ্রহী এবং এ ব্যাপারে অগ্রণী। "যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট"। মুমিনরা যুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না, তারা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়, নিরুপায় হয়ে যুদ্ধে জড়ায়।

যখন হুদায়বিয়ার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে সন্ধির মাধ্যমে এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে যাবার উপক্রম হবার পর এবং নবী করীম (সা.) তাঁর সাহাবাদের নিকট থেকে জীবনপণ বাইয়াত গ্রহণ করেন, এই ঐতিহাসিক চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সূরাতুল ফাতহ্ নাযিল হয় এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে। সেখানে রাসূল (সা.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়ঃ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ (الفتح : ١)

"নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।" (সূরা ফাতহ্ ঃ ১)

একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেন- হে আল্লাহর রাসূল! এটি কি বিজয়? তিনি বললেনঃ "হাঁ, এটি বিজয়।"[১] তিনি চিন্তাই করতে পারেননি যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যতিরেকেই বিজয় হতে পারে।

রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেনঃ "তোমরা শত্রুর (যুদ্ধের

---

১. আবু দাউদ, জিহাদ অধ্যায়, হাদীস নং ২৭৩৬, মাজমা বিন জারিয়া (রা.) থেকে।

জন্য) সাক্ষাৎ কামনা করো না। মহান আল্লাহর নিকট নিরাপদ থাকার জন্য প্রার্থনা কর। কিন্তু যদি সাক্ষাৎ ঘটে যায় তাহলে ধৈর্য ধারণ করবে। জেনে রেখো, জান্নাত হল তরবারির ছায়ার নিচে।"[১]

তিনি মনে করেন শান্তি ও নিরাপত্তাই হল নিরাপদ থাকার উপায় যা প্রত্যেক মুসলমান কামনা করে এবং মহান আল্লাহর নিকট সর্বদা দু'আ-প্রার্থনা করতে থাকে নিরাপদে থাকার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ـ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।"[২]

রবং নবী করীম (সা.) যুদ্ধ (حرب) শব্দটিকেই অপছন্দ করতেন। তিনি সেটি শুনতেই পছন্দ করতেন না। এ জন্যই তিনি বলেছেনঃ

أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَأَقْبَحُ الأَسْمَاءِ حَرْبٌ وَمُرَّةٌ ـ

"আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাম হল- আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) ও আব্দুর রহমান (দয়াময় প্রভুর বান্দা) এবং ঘৃণিত নাম হল- হারব (যুদ্ধ) ও মুর্‌রা (তিতা)।"[৩]

কিন্তু মুসলমানদেরকে যদি আহ্বান করা হয় দীন, জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও দেশ রক্ষার জন্য: তাহলে তারা দ্রুত ছুটে আসবে, তারা পেছনে পড়বে না বা জমিনকে আঁকড়ে ধরবে না। যেমনটি মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ

১. বুখারী হাদীস নং ২৯৬৬, মুসলিম হাদীস নং ১৭৪২, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) থেকে।

২. আবু দাউদ হাদীস নং ৫০৭৪, ইবনে মাজা হাদীস নং ৩৮৭১, হাকেম হাদীস নং ১/৫১৭ ইবনে উমর (রা.) থেকে।

৩. আবু দাউদ, আদাব অধ্যায়, হাদীস নং ৪৯৫০, আবু ওহাব জুশামী (রা.) থেকে।

سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَي الاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الاخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الاخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ ـ اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَتَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ (التوبة : ٣٨-٣٩)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমিনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (সূরা তাওবা : ৩৮-৩৯)

চরমপন্থা কি মুসলমানদের নিকট স্বাভাবিক পন্থা?

এ হল ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক অবস্থান। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল- আমরা লক্ষ্য করছি যে, পশ্চিমারা এমনভাবে মুসলমানদেরকে চিত্রিত করছে যেন তারা হিংস্র পশু। এটি তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। তাদের ছোটরা এর উপরই বেড়ে উঠছে, বড়রা এই বিশ্বাসকে লালন করেই বয়ঃবৃদ্ধ হচ্ছে, এমনটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই ঘটছে।

তারা আরো অভিযোগ করে– মুসলমানদের বিশ্বাসের মূলভিত্তি হল- মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর প্রতি যিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী, পর্যুদস্তকারী। মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে তারা তাদের আল্লাহর রঙে নিজেদের রাঙাবে, তাঁর মহাপরাক্রমের গুণে গুণান্বিত হবে, তাঁর মত প্রতিশোধ

পরায়ণ হবে আর এজন্যই মুসলমানরা তাদের দীনের শত্রুর ব্যাপারে সামান্য দয়ামায়া প্রদর্শন করে না। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন এই বলেঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ - (التوبة : ٧٣)

"হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান!" (সূরা তাওবা ঃ ৭৩)

মুসলমানদের এভাবে চিত্রিত ও চিহ্নিত করা নিঃসন্দেহে মারাত্মক ভুল ও চরম জুলুম।

ইসলামী ধর্মীয় বিশ্বাসে মহান আল্লাহ্ যেমন মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ও পর্যুদস্তকারী; তেমনি তিনি অপরিসীম দয়ালু ও দাতা, করুণাকারী, অনুগ্রহকারী, দানশীল ও সহিষ্ণু গুণে গুণান্বিত। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর আর নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা মায়েদা ঃ ৯৮)

তিনি আরো বলেনঃ

اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (الأنعام : ١٦٥)

"নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আনয়াম ঃ ১৬৫)

তিনি অন্যত্র বলেনঃ

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ج وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ - (الرعد : ٦) .

"আর নিশ্চয় তোমার রব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের যুলুম সত্ত্বেও এবং নিশ্চয় তোমার রব কঠিন শাস্তিদাতা।" (সূরা রা'দ ঃ ৬)

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেনঃ

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الاَلِيْمُ ـ (الحجر : ٤٩-٥٠)

"আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার আযাবই যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" (সূরা রা'দ ঃ ৪৯-৫০)

এখানে লক্ষ্য করুন, তিনি ক্ষমা এবং দয়া করাকে নিজের নামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর শাস্তি দানকে তিনি নিজের কর্মের অন্তর্গত হিসেবে উল্লেখ করেছেন–

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ـ (المؤمن : ٣)

"তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর আযাব দাতা, অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন।" (সূরা মুমিন ঃ ৩)

আমরা এভাবেই দেখতে পাই, শক্তির নাম ও রহমতের নামের মধ্যে ভারসাম্য এবং মহাপরাক্রমশালী ও সৌন্দর্য নামের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে, যেমনটি বিশেষজ্ঞ আলেমগণ উল্লেখ করে থাকেন।

যে কেউ গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করবে, সেই দেখতে পাবে রহমত, দয়া ও করুণা নামগুলোই আল্লাহর কিতাবে অধিকাংশ স্থানে এবং একাধিক বার উল্লেখ করা হয়েছে।

বরং বাস্তবতা হল মহান আল্লাহর নাম জাব্বার (الجبار) মহাপ্রতাপশালী নামটি একটিবার মাত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে সূরা হাশরের শেষ দিকে তাঁর অনেকগুলো সুন্দর গুণবাচক নামের মধ্যে। তিনি বলেনঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - (الحشر : ٢٣-٢٤)

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও জমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা হাশর ঃ ২৩-২৪)

জাব্বার (الجبار) নামের অর্থ যিনি মহাপ্রতাপশালী যার নির্দেশ মানতে অন্যরা বাধ্য। তিনি তাদেরকে যা ইচ্ছা তা করতে বাধ্য করেন।[১] এ জন্যই এটিকে আযীয [মহাপরাক্রমশালী] ও মুতাকাব্বির [অতীব মহিমান্বিত] শব্দদ্বয়ের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো শক্তি-সামর্থ্যের অর্থ বহন করে। এর অর্থ হল- পৃথিবীর অত্যাচারী, অহংকারীদেরকে জানিয়ে দেয়া যে, তারা যেন নিজেদের গণ্ডীর পরিসীমা জানতে পারে মহান আল্লাহর শক্তির মোকাবিলায় যাঁকে জমিন ও আসমানে কেউ পর্যুদস্ত-পরাস্ত করতে সক্ষম নয়।

এতদসত্ত্বেও এর সাথে তিনি 'সালাম' (শান্তি-নিরাপত্তা) নামটি যুক্ত করেছেন নিজের নামের সাথে, যার জন্য আজ মানুষ আর্ত-চিৎকার করছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মুসলমানদের মাঝে 'আবদুস সালাম' (শান্তিদাতার বান্দা) নামটি ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, সাথে সাথে

১. কেউ কেউ বলেন, জাব্বার (মহাপ্রতাপশালী) হলেন তিনি যিনি দুর্বলদের দুর্বলতা দূর করে তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটান, যদিও এই অর্থটি ধারাবাহিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। দেখুন, তাফসীরে কুরতুবী- সূরা হাশরের শেষাংশের ব্যাখ্যা।

আব্দুল মুমিন (নিরাপত্তাদানকারীর বান্দা) নামটি যার অর্থ হল নিরাপত্তাদান ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাস থেকে এবং ঈমান দান করেন নাফরমানী থেকে মুক্ত করে।

কুরআন মজীদে কাহ্হার (القهار) [একচ্ছত্র ক্ষমতাধর বা পর্যুদস্তকারী] শব্দটি মাত্র ছয় জায়গাতে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনটি মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - (الرعد : ١٦)

"বল, আল্লাহ্‌ই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক একচ্ছত্র ক্ষমতাধর।" (সূরা রা'দ ১৬)

ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায়, তিনি তাঁর সঙ্গী বন্দী দু'জনকে বলেছিলেন যারা ছিল মূর্তিপূজকঃ

يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - (يوسف : ٣٩)

"হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি একচ্ছত্র ক্ষমতাধর এক আল্লাহ্।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯)

যেন তারা তুলনা করতে পারে তাদের ভ্রান্ত প্রভু এবং এই মহান প্রভুর মাঝে।

সূরা সোয়াদে বলা হয়েছেঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - (ص : ٦٥)

"বল, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই। যিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর।" (সূরা সোয়াদ ঃ ৬৫)

আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এখানে নির্দেশ করছেন যেন তিনি আল্লাহ্‌র গুণাবলী থেকে মুক্ত করেন, তিনি তো একজন সতর্ককারী ছাড়া অন্য কিছু নন, আর সত্যিকার ইলাহ্ হলেন সেই আল্লাহ্ যিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এসব নাম আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই উল্লেখ করা হয়েছে যেন উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

আল-মুনতাকিম (المنتقم) [প্রতিশোধ গ্রহণকারী] নামটি কুরআন মজীদের কোথাও একক নাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং অন্যভাবে (গুণবাচক শব্দ যোগ করে) (ذو انتقام) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অত্যাচারী, একনায়ক ও কাফেরদেরকে ধমক দেয়ার উদ্দেশ্যে। যেমনটি তিনি বলেনঃ

وَاِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ انْتِقَامٍ ـ (آل عمران : ٤)

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৪)

সূরা ইবরাহীমে কাফের জালেমদেরকে, নবী-রাসূলদের ব্যাপারে তাদের অবস্থানকে নিন্দা করা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ـ (ابراهيم : ٤٧)

"সুতরাং তুমি কখনো আল্লাহকে তাঁর রাসূলদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৭)

সূরা যুমারে যারা রাসূলদেরকে প্রতিমার ভয় দেখাচ্ছিল তাদের সে বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ط وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ـ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ط اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ـ (الزمر : ٣٦-٣٧)

"আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখায়। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হিদায়েতকারী নেই। আর আল্লাহ্ যাকে হিদায়েত করেন, তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহ্ কি মহাপরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?" (সূরা যুমার ঃ ৩৬-৩৭)

মুনতাকিম (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) শব্দটি বহুবচন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মহান আল্লাহ্র এ বাণীতেঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ط اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ - (السجدة : ٢٢)

"আর তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পর তা থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমরা প্রতিশোধগ্রহণকারী অপরাধীদের থেকে।" (সূরা সিজদা ঃ ২২)

বহুবচনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত বাণীতেঃ

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ - (الدخان : ١٦)

"যেদিন আমি বড় আঘাত করবো, সেদিন অবশ্যই আমি তোমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।" (সূরা দুখান ঃ ১৬)

এসব নাম আল্লাহ্ তা'আলার মহান গুণাবলীই প্রমাণ করে থাকে, তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা ও মহানুভবতার কথাই বুঝিয়ে থাকে। যেমনটি তিনি নিজেই নিজেকে বিশেষিত করেছেনঃ

ذُوْ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - (الرحمن : ٢٧)

"(তিনি) মহামহিম ও মহানুভব।" (সূরা রহমান ঃ ২৭)

এসব গুণাবলীকে সৌন্দর্যমূলক হিসেবেও বলা হয়ে থাকে। আর এসব নাম বা গুণাবলীই কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাব- রহমত, দয়াশীলতা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, ইহসান ইত্যাদি নামগুলোই কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বিসমিল্লায় রহমান [পরম করুণাময়] ও রহীম [অতীব দয়ালু] নামটি বিসমিল্লায় (بسم الله الرحمن الرحيم) কুরআন মজীদের ১১৩টি সূরার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সূরা ফাতিহাতে যা একজন মুসলমান দৈনিক নামাযে কমপক্ষে সতের বার পাঠ করে থাকে- "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর-রাহমানির রাহীম।"

আমরা আরো লক্ষ্য করলে দেখতে পাই কুরআন মজীদে ১১৩টি সূরার প্রথমে ছাড়াও পাঁচ জায়গাতে রহমান ও রহীম নামটি একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা দেখতে পাই মহান আল্লাহর এ বাণীতে ঃ

قَالَ عَذَابِىْ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ - (الاعراف : ١٥٦)

"তিনি বললেন, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে আমার শাস্তি দিয়ে থাকি। আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৬)

এখানে তিনি শাস্তি প্রদানকে তাঁর ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত করেছেন আর রহমতকে কোন রকমের শর্তাধীন না করে উন্মুক্ত রেখেছেন।

আমরা কুরআনে উল্লেখ পাই যে, ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য এভাবে দু'আ করেনঃ

رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ - (المؤمن : ٧)

"হে আমাদের রব! আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন।" (সূরা মুমিন ঃ ৭)

আমরা কুরআন মজীদে একটি পূর্ণ সূরা দেখতে পাই যার নাম রাখা হয়েছে আর-রহমান (পরম করুণাময়) নামে। যা শুরু করা হয়েছে এভাবেঃ

اَلرَّحْمٰنُ ـ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ـ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ـ (الرحمن : ١-٤)

"পরম করুণাময়, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা।" (সূরা রহমান ঃ ১-৪)

আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ নিজের নাম হিসেবে 'রহমান'কে ব্যবহার করেছেন তাঁর 'আল্লাহ' নামের মতই। তিনি বলেনঃ

قُلْ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامًّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ (الإسراء : ١١٠)

"বল তোমরা (তোমাদের রবকে) আল্লাহ নামে ডাক অথবা রহমান নামে ডাক, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০)

এই নামটি কুরআনে ৫৭ (সাতান্ন) বার উল্লেখ করা হয়েছে বিসমিল্লাহ ব্যতিরেকেই।

আমরা দেখতে পাই যে, রহীম (الرحيم) [অতীব দয়ালু] নামটি কুরআন মজীদে ৯৫ (পঁচানব্বই) বার উল্লেখ করা হয়েছে বিসমিল্লাহ ব্যতিরেকেই। কখনো রহমান নামের সাথে আবার কখনো অন্য নামের সাথে যেমন 'গফুর' [ক্ষমাশীল]। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে এই বাণীতেঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ (الزمر : ٥٣)

"বল, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা যুমার ঃ ৫৩)

কখনো রাউফ (الرءوف) নামের সাথে যুক্ত করে। যেমন মহান আল্লাহর এ বাণীতেঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - (البقرة : ١٤٣)

"আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)

কখনো আল-বার (البَرُّ) [ইহসানকারী] নামের সাথে যুক্ত করে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ - (الطور : ٢٨)

"নিশ্চয় পূর্বে আমরা তাঁকে ডাকতাম; নিশ্চয় তিনি ইহসানকারী, পরম দয়ালু।" (সূরা তূর ঃ ২৮)

আত-তাওয়াব (التواب) [তাওবা কবুলকারী] নামের সাথে যুক্ত করেঃ

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - (التوبة : ١١٨)

"নিশ্চয় তিনিই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবা ঃ ১১৮)

আযীয (العزيز) [মহাপরাক্রমশালী] নামের সাথে যুক্ত করেঃ

تَنْزِيْلُ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ - (يس : ٥)

"মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াময় (আল্লাহ) কর্তৃক নাযিলকৃত।" (সূরা ইয়াসিন ঃ ৫)

আমরা কুরআন মজীদে দেখতে পাই যে, আরহামুর রাহেমীন (ارحم الراحمين) [সবচেয়ে বেশী দয়ালু] নামে মহান আল্লাহকে ভূষিত করা হয়েছে ৫ (পাঁচ) জায়গাতে এবং খায়রুর রাহেমীন (خير الراحمين) [সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু] নামে ভূষিত করা হয়েছে ২ (দুই) জায়গায়।

তাহলে এরা কিভাবে ধারণা করতে পারে যে, মুসলমানদের প্রভুর পরাক্রমশালী, পর্যুদস্তকারী, কঠিন, প্রতিশোধ গ্রহণকারী গুণাবলী ছাড়া

অন্য কোন গুণাবলী নেই? আর মুসলমানেরা সেসব গুণাবলীই নিজেদের মাঝে রপ্ত করেছে?

তাওরাতের 'সাফারুল খুরুজ'-এ তাদের প্রভুর যে গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে যার প্রতি ইহুদী-খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই বিশ্বাস রাখে- যেখানে তাদের প্রভুকে বিশেষিত করা হয়েছে প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসেবে। এমনকি সন্তানকে তার পিতার অপরাধে শাস্তি দিয়েছেন, পৌত্রদেরকে এমনকি পরপর চার প্রজন্মকে তাদের বাপ-দাদাদের পাপের কারণে শাস্তি দিয়েছেন।

তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে– মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "আমিই তোমার প্রভু। পরম আত্মমর্যাদা সম্পন্ন প্রভু। পিতার পাপের কারণে সন্তানকে শাস্তি দেই। এমনকি তৃতীয় প্রজন্মকে এবং চতুর্থ প্রজন্মকে এজন্য শাস্তি দিয়ে থাকি।[১]

অথচ কুরআন মজীদে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে শাস্তি দেয়া যাবে না। একজনের গুনাহের কারণে অন্যজন জিজ্ঞাসিত হবে না। যদিও সে তার নিকটাত্মীয় হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

كُلُّ نَفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ - (المدثر : ٣٨)

"প্রতিটি প্রাণ নিজ অর্জনের জন্য দায়বদ্ধ।" (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৩৮)

তিনি আরো বলেনঃ

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخْرَى - (الأنعام : ١٦٤)

"আর প্রতিটি ব্যক্তি যা অর্জন করে, তা শুধু তারই উপর বর্তায়, আর কোন ভারবহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না।" (সূরা আনয়াম ঃ ১৬৪)

আর এ কথাই সাব্যস্ত করে যে, এ বিষয়টি সমস্ত আসমানী কিতাবে স্বীকৃত-

১. সাফারুল খুরুজ : (২০/৫)

اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسَى - وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفَّى - اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى - (النجم : ٣٦-٣٨)

"নাকি মুসার কিতাবে যা আছে, সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়নি? আর ইবরাহীমের কিতাবে, যে (নির্দেশ) সে পূর্ণ করেছিল। তা এই যে, কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।" (সূরা নজম ঃ ৩৬-৩৮)

কুরআন ঘোষণা করেছেঃ মুহাম্মদের রিসালাত হল বিশ্বজাহানের জন্য রহমত স্বরূপ। যেমনটি মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ - (الانبياء : ١٠٧)

"আর আমি আপনাকে বিশ্বজাহানের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭)

মুহাম্মদ (সা.) নিজের সম্পর্কে বলেনঃ "নিশ্চয় আমি রহমত স্বরূপ এবং পথপ্রদর্শক।"[১]

মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রশংসা করে সম্বোধন করেন তাঁর এ বাণীতেঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ - (آل عمران : ١٥٩)

"আর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের প্রতি নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

দয়াশীলতার চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর রিসালাতে, তাঁর জীবন-চরিতে।[২]

---

১. ইমাম হাকেম হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন (১/৩৫) এবং হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম যাহাবী এই অভিমতকে সমর্থন করেছেন।

২. দেখুনঃ অধ্যায়- চরমপন্থা ও প্রতিশোধ থেকে নম্রতা ও দয়াশীলতার দিকে, লেখক কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ- আস্‌সাহওয়া আল-ইসলামিয়া মিনাল মুরাহাকা ইলার রুশদ, প্রকাশক- দারুশ শরুক, কায়রো।

তিনি বলেনঃ

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ، اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ ـ

"দয়াশীলদের প্রতি দয়াবান আল্লাহ্ দয়া করেন। তোমরা যমিনে যারা রয়েছে তাদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানে যারা রয়েছেন তারা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"[১]

তিনি আরো বলেনঃ

مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ ـ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেন না।"[২]

কুরআন মজীদে নেককার বান্দাদের প্রশংসা করা হয়েছেঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ـ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لاَ نُرِيْدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَّلاَ شُكُوْرًا ـ (الدهر : ٨-٩)

"তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাদ্য দান করে। তারা বলে- আমরাতো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না।" (সূরা দাহার ঃ ৮-৯)

আর বনী ইসরাঈলকে তাদের অন্তরের কাঠিন্যতার জন্য তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হয়েছেঃ

---

১. আবু দাউদ ৪৯৪১, তিরমিযী ১৯২৫, তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত।

২. বুখারী ও মুসলিম জারীর (রা.) থেকে। আহমদ ও তিরমিযী আবু সাঈদ (রা.) থেকে, সহীহুল জামে ৬৫৯৭

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً - (البقرة : ٧٤)

"অতঃপর তোমাদের অন্তরসমূহ এর পরে কঠিন হয়ে গেল যেন তা পাথরের মত কিংবা তার চেয়েও শক্ত।" (সূরা বাকারা ঃ ৭৪)

অন্তরের কাঠিন্যতাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে বলেনঃ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً - (المائدة : ١٣)

"সুতরাং তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লানত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহকে করেছি কঠোর।" (সূরা মায়েদা ঃ ১৩)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ - وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ - (الماعون : ١-٣)

"তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব-প্রতিদানকে অস্বীকার করে? সে-ই ইয়াতীমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।" (সূরা মাউন ঃ ১-৩)

এখানে ইয়াতীমের সাথে কঠোর আচরণ করাকে, মিসকীনকে খাদ্যদানে গুরুত্ব না দেয়াকে কুফরীর প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যা মানুষকে পরকালের হিসাব-নিকাশ পর্যন্ত অস্বীকার করার পর্যায়ে নিয়ে যায়।

পশ্চিমা সভ্যতা কি খৃষ্টীয় সভ্যতা?

আমরা লক্ষ্য করছি যে, পশ্চিমারা নিজেদেরকে খৃষ্টান বলে ধারণা করে থাকে। আর তাদের সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে 'খৃষ্টান সভ্যতা'র[১] উপর। তারা গর্ব করে এই বলে যে, খৃষ্টধর্ম হল- শান্তি ও ভালবাসার ধর্ম। মসীহ (আ.) কারো প্রতি তরবারী উঁচু করেননি। বরং তিনি তার অনুসারীদের বলেছেনঃ যদি কেউ তোমার ডান গালে আঘাত করে তাহলে তুমি তার দিকে তোমার বাম গাল এগিয়ে দিবে। আর কেউ যদি তোমাকে তার সাথে এক মাইল পথ যেতে বাধ্য করে তাহলে তুমি তার সাথে দুই মাইল যাও। আর কেউ যদি তোমার জামাটি নিয়ে নিতে চায় তাহলে তুমি তাকে তোমার লুঙ্গিটিও দিয়ে দাও।[২]

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করা যাবে না। শক্তিকে শক্তি দ্বারা প্রতিহত করতে হবে না। বরং মসীহ তাঁর অনুসারীদের আহ্বান করেছেন যেন তারা তাদের শত্রুদের ভালবাসে এবং তাদের কর্মকাণ্ডে তাদেরকে সহায়তা করে।[৩]

তাহলে এ কথার সত্যতা কোথায়? পশ্চিমারা কি সত্যিকার অর্থে খৃষ্টান? ইঞ্জিলের উপদেশাবলীর কোন প্রভাব কি খৃষ্টানদের জীবনে দেখা যায়? খৃষ্টানরা কি মসীহ-এর শিক্ষা নিজেদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করেছে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে তাদের আচরণে লক্ষ্য করা গেছে?

---

১. পশ্চিমা সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টান সভ্যতা নয়। এ সভ্যতা ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ নিমগ্ন। আর খৃষ্টবাদ নিমগ্ন আধ্যাত্মিকতায়। পশ্চিমা সভ্যতা বৈধতা দিয়েছে অবাধ যৌনাচারের ও সবধরণের নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার। আর মসীহ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি চোখ দিয়ে (খারাপ কিছু) দেখলো, সে ব্যভিচার করল। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, এটি মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর সভ্যতা নয়; বরং এটি মসীহুদ্দাজ্জালের সভ্যতা। এটি একচোখ কানা সভ্যতা। এটি কানা সভ্যতা। এটি জীবন, মানুষ ও বিশ্বের দিকে একচোখে দৃষ্টি দেয়। আর তা হল- ভোগ-বিলাসের দৃষ্টিতে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- লেখকের 'ইসলাম আগামীর সভ্যতা' গ্রন্থের 'বর্তমান সভ্যতার প্রাণ' নামক অধ্যায়, পৃ. ১১-২৫, প্রকাশনায়ঃ মাকতাবুল ওহবা, কায়রো এবং মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

২. দেখুনঃ ইঞ্জিল মেথি, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৩৯-৪২; ইঞ্জিল লুকা ঃ ৬ঃ২৯.,৩০

৩. ইঞ্জিল মেথি ঃ ৫ঃ৪৩,৪৪; ইঞ্জিল লুকাঃ ৬ঃ২৭,২৮

এমনকি তারা নিজেরা পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে তা পালন করেছে?

ইতিহাস ও বাস্তবতা বলছেঃ খৃষ্টানরা মসীহ্-এর অনুসারীরা -সাধারণভাবে- এই উপদেশাবলী থেকে অনেক দূরে। তারা কেউ তাদের ডান গালে মারলে বাম গাল এগিয়ে দেয় না। বরং তারাই বিশ্ববাসীর দুই গালে প্রথমেই মারতে শুরু করেছে কোন রকমের কারণ ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে শত্রুতামূলক আচরণ করে।

খৃষ্টানরা ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে তাদের বিরোধিতাকারী জাতিগুলোকে হত্যা করে আসছে। এখনও অনেক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা এ কথার সাক্ষী হিসেবে বেঁচে রয়েছে। তারা মিলিয়ন মিলিয়ন লোককে হত্যা করেছে। অতি নিকট ইতিহাসও এ কথার সাক্ষী দিচ্ছে যা কখনো ভুলবার নয়।

ক্যাথলিকরা তাদের উৎপত্তির পর পরই লক্ষ লক্ষ প্রোটেস্ট্যান্টকে হত্যা করে। আর প্রোটেস্ট্যান্টরা বিজয়লাভের পর লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিককে হত্যা করে।[১]

তারা নিজেরা নিজেদেরকে বিংশ শতাব্দীর দুই বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। তারা সকলেই ছিল খৃষ্টান। তারা ছিল ইঞ্জিলে বিশ্বাসী এবং মসীহ্-এর শান্তির ধর্মে বিশ্বাসী। এমনকি কতিপয় পশ্চিমা খৃষ্টান গবেষক বলেছেনঃ তারা মসীহ-এর নবুয়তে বিশ্বাসী নয়, যেমনটি তারা তাঁর কথাকে এই বলে বিশ্বাস করেছে যে, আমি এই দুনিয়াতে শান্তি নিয়ে আসিনি আমি এসেছি তরবারী নিয়ে।[২]

এর দ্বারা ইতিহাস প্রমাণ করে এবং বাস্তবতাও প্রমাণ করে যে, শান্তির ও ভালবাসার অনুসারীরাই দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী রক্ত ঝরিয়েছে এবং অতি দ্রুত অন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিত করেছে। আর তারা বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়েছে অন্যদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে।

---

১. দেখুনঃ শায়খ রহমতুল্লাহ হিন্দীর লিখা 'এজহারুল হক' নামক গ্রন্থে। এতে তিনি ঘটনাবলী ও সংখ্যাসহ খৃষ্টানদের বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহ তাদের জুলুম অত্যাচার, হত্যা-লুটতরাজ, যুদ্ধ-বিগ্রহের এক বীভৎস চিত্র তুলে ধরেছেন। পৃ. ৫০৯-৫২৮, আরবী সংস্করণ- এহইয়াউত তুরাস আল-ইসলামী, কাতার।

২. ইঞ্জিল মেথিঃ ১০ঃ৪৩; ইঞ্জিল লুকাঃ ১২ঃ১৫

আমরা নিজ চোখেই দেখলাম বাস্তব অবস্থা এবং নিজের হাতে স্পর্শ করলাম, দেখলাম আজকের পরাশক্তি বিশ্বের প্রভু "আমেরিকার শক্তি" যা এই পৃথিবীর বুকে রাজত্ব চালাচ্ছে প্রভুর আসনে বসে। তাকে 'জিজ্ঞেস করা যাবে না সে কি করল, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।' এর সামরিক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব দেখতে পেলাম আফগানিস্তান ও ইরাকে। সেখানে তার ধর্মীয়, চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থান দেখা গেছে ইরাকের কারাগারগুলোতে সে কি করেছে, বিশেষ করে আবু গরীব কারাগারে এবং এর পূর্বে গুয়ান্তানামো কারাগারে বন্দীদের সাথে। সেখানে বন্দীদের সাথে এমন আচরণ করা হয়েছে যা কোন ধর্ম, নীতিনৈতিকতা, প্রচলিত প্রথা ও আইন-কানুন সমর্থন করে না।

তেমনিভাবে তার অবস্থান দেখতে পায় যায়নবাদী ইহুদীদেরকে ও তাদের রাষ্ট্র ইসরাইলকে সদাসর্বদা অকুণ্ঠ সমর্থন দানের ক্ষেত্রে, যাকে সে অস্ত্র ও অর্থবল দিয়ে ফিলিস্তিনীদের হত্যা করতে, তাদের ঘরবাড়ি, দালান-কোঠা ধ্বংস করতে, তাদের ভূমি দখল করতে, তাদের ফসল-পানি, শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট করতে, তাদের গাছ-পালা জোরপূর্বক উপড়িয়ে ফেলতে, তাদের ছিন্নভিন্ন করতে, তাদেরকে বেষ্টনী দেয়াল দিয়ে ঘিরে গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করতে, তাদের সমাজের সবকিছুকে ধ্বংস ও নির্মূল করতে অন্ধভাবে সমর্থন দানের ক্ষেত্রে।

আমেরিকার ক্ষমতার মসনদ রয়েছে বর্তমানে কট্টর ডানপন্থী খৃষ্টানদের হাতে এবং তাদের পুরোধা হল জর্জ জুনিয়র বুশ। সে আল্লাহর বা মসীহ এর নৈকট্য লাভ করতে চায় মুসলমানদের হত্যা করে, তাদের শাস্তি দিয়ে, তাদেরকে ক্ষুধায় কষ্ট দিয়ে। সে-ই এই জমিনের বুকে চরমপন্থা-কট্টরতা প্রয়োগ করছে আকাশের প্রভুর নামে। সে নিজেকে মনে করছে এবং তার সহযোগীরাও মনে করছে- প্রভুর প্রেরিত পুরুষ বলে। তাদের কেউ কেউ বলেছে- নির্বাচনের মাধ্যমে বুশ হোয়াইট হাউজে আসেনি, আল্লাহই বুশকে সেখানে এনেছেন। যেমনটি বহুপূর্বে মনে করেছিল চেঙ্গিস খান, যে গোটা দুনিয়া জুড়ে চালিয়েছিল হত্যা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সমসাময়িক রাজা-বাদশাহদেরকে এবং রাজ্যগুলোকে, মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল।

তাওরাত ও চরমপন্থা

ইসলাম তার বিরোধীদের উপর শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি কি সংস্কার, নতুনত্ব ও মর্যাদাকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা যদি কেউ জানতে চায় পূর্বের শরিয়ত ও ধর্মীয় বিধানের স্থানে, তাহলে তাকে খুব দ্রুত হলেও দৃষ্টি দিতে হবে তাওরাতে কি রয়েছে (বর্তমান সংস্করণগুলোতেও) যার উপর সমস্ত ইহুদী ও খৃষ্টান ঈমান রাখে। আর সেটিই হল প্রভুর কিতাব যা তিনি মুসার উপর নাযিল করেছেন। আর মসীহ (আ.) ঘোষণা করেন যে, তিনি এসেছন মুসা (আ.) যা এনেছেন তার বিরোধীতা নয় বরং তার পরিপূর্ণতা বিধান করতে এসেছেন।[১]

আমরা জানি না, পশ্চিমারা কি এসব পড়েছে, যারা ইসলামকে অভিযুক্ত করে যে সেটি 'তরবারির ধর্ম'। আর যারা ধারণা করে যে, তারা 'পবিত্র কিতাব' (তাওরাত)-এর উপর ঈমান রাখে, তারা কি এই বাণীগুলো পড়েনি? নাকি তা অনুধাবন করেনি? নাকি পড়েও তা তাদের বোধগম্য হয়নি?

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনিই ন্যায়নিষ্ঠ দৃষ্টিতে দেখুন, তাওরাত যুদ্ধ এবং হত্যার বাপারে, বিরোধীদের সাথে চারমপন্থা-বাড়াবাড়ি ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি বলে।

তাওরাতে সাফারু তাসনিয়াতুল এশতেরা, অধ্যায় কুড়ি-এর অধীনে 'দূরবর্তী শহর অবরোধ ও তা বিজয়ের বিধি-বিধান' শিরোনামে বলা হয়েছেঃ

"যখন তোমরা কোন শহরে যুদ্ধ করতে যাবে তখন সেখানকার অধিবাসীদেরকে প্রথমেই সন্ধির জন্য আহ্বান করবে। যদি তারা সন্ধি প্রস্তাবে সাড়া দেয় এবং তোমাদের নিকট আত্মসমর্পন করে তাহলে সেখানে বসবাসকারী সমস্ত লোকজন তোমাদের দাসে পরিণত হবে। আর যদি

---

১. ইঞ্জিল মেথি- অধ্যায়-৫ঃ তোমরা মনে করোনা যে, আমি নবীদের শরিয়ত বাতিল করতে এসেছি। বরং আমি এসেছি তার পরিপূর্ণতা বিধান করতে, অনুচ্ছেদ ১৭; দেখুনঃ ইঞ্জিল মারকাসঃ ৯ঃ৫০

তারা সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তাদেরকে অবরুদ্ধ কর। যখন তোমাদের প্রভু তাদেরকে পরাভূত করবেন তোমাদের হাতে তখন তোমরা তাদের সকল পুরুষকে তরবারি দ্বারা হত্যা করবে। আর শহরের নারী, শিশু ও জীব-জন্তু সব তোমাদের জন্য গনিমত, তোমরা তা ভোগ করবে। তোমরা তোমাদের দেয়া প্রভুর গনিমত নিয়ে উপভোগ করবে। তোমরা এভাবেই সব দূরবর্তী শহরগুলোকে পদানত করবে এবং সেখানে তোমরা এভাবেই তোমাদের কর্মকাণ্ড চালাবে।

এই হল তাওরাতের সুস্পষ্ট কঠোর নির্দেশনা বনী ইসরাইলদের জন্য বা ইহুদীদের জন্য যারা মুসার শরীয়তে বিশ্বাসী দূরবর্তী শহর অবরুদ্ধ ও বিজয় করার ব্যাপারেঃ যদি সন্ধির ব্যাপারে সাড়া দেয় তাহলে সকল অধিবাসীরা হবে তাদের দাস কোন রকমের ব্যতিক্রম ছাড়াই! আর যদি তারা সন্ধি প্রস্তাবে সাড়া না দেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। যদি তাদের হাতে পতন ঘটে তাহলে তাদের উপর ওয়াজিব হল সমস্ত পুরুষদেরকে তরবারির আঘাতে হত্যা করতে হবে, এটি তাদের প্রভুর নির্দেশ। তাওরাতের শরীয়তে হত্যার কোন বিকল্প দেয়া হয়নিঃ তারা ইহুদী ধর্মে দিক্ষীত হবে বা তারা নিরাপত্তা কর (জিযিয়া) প্রদান করবে বা অন্য কিছু। তাদের প্রভুর নির্দেশে কোন ব্যতিক্রম রাখা হয়নি পুরুষদের মধ্যে সে বৃদ্ধ হোক, বড় হোক বা ছোট শিশু হোক।

এখানে কুরআন বলছেঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا - (محمد : ٤)

"অতএব তোমরা যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ বন্ধ হয়।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪)

এখানে কুরআন শত্রুর সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাদেরকে দুর্বল করতে নির্দেশ দিয়েছে, তাদেরকে যেন হত্যার পরিবর্তে বন্দী করা হয়।

কুরআন আরো বলছেঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صٰغِرُوْنَ - (التوبة : ٢٩)

"তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) দেয়।" (সূরা তাওবা ঃ ২৯)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধকারী শত্রুদের জন্য হত্যা থেকে বাঁচার সুযোগ করে দিয়েছে এবং জোরপূর্বক ইসলামে দিক্ষিত হওয়া থেকে জিযিয়া দিয়ে। অর্থাৎ সামর্থ্য থাকলে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বেঁচে যাবার সুযোগ করে দিয়েছে ইসলাম, তাদের জানমালের নিরাপত্তারও দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

প্রতিশ্রুত ভূমি, শহর অবরোধ ও বিজয়ের বিধান

যেসব স্থানকে 'প্রতিশ্রুত ভূমি' বলে তারা (ইহুদীরা) উল্লেখ করে থাকে সেসব স্থানে অধিবাসীদের সম্পর্কে তাওরাত বলেঃ "যেসব শহর-জনপদ তোমাদের প্রভু তোমদের দান করেন সেসব স্থানের অধিবাসীরা তোমাদের মিরাস। সেখানে কোন মানুষকে জীবন্ত রাখবে না। বরং ধ্বংস কর তাদের গোষ্ঠীসুদ্ধ। যেমনটি ধ্বংস করেছো, হিসসীন, আমুরীয়, কেনানী, ফারযীন, হুওয়য়ীন এবং ইয়াবুসীদেরকে? । যেমনটি তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেন তারা যে ইবাদতের ক্ষেত্রে অপবিত্রতার সৃষ্টি

করেছিল তার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে। তোমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন কর এবং তোমাদের মহান প্রভুর দিকে এগিয়ে চল।[১]

এই ছয় জাতিকে একেবারে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। কোন রকমের দাওয়াত বা আহ্বান ছাড়াই বা তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ না করেই কিংবা কোন রকমের সন্ধি না করেই- তাদের ভাগ্যে তরবারি ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নেই। তাদের জন্য রয়েছে মৃত্যু, ধ্বংস- এই হল এই হতভাগা জাতির ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! তাদের একমাত্র অপরাধ তারা তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে বসবাস করছিল।

তাওরাতের ব্যাখ্যাকারকগণ এই অনুচ্ছেদের উপর লিখেনঃ "দয়ালু প্রভুর পক্ষে কিভাবে সম্ভব যে তিনি নির্দেশ দিলেন সমস্ত জনপদের কেন্দ্রগুলোকে ধ্বংস করার তার অধিবাসীসহ? এটি করেছেন বনী ইসরাইলকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করার জন্যই, যা ওরা করত, আর এটিই করা দরকার তাদের উপর মন্দ আচরণ করাই ওয়াজিব (২০ঃ১৮)। আর প্রকৃত কথা হল- যদি বনী ইসরাঈল এসব জাতিকে নির্মূল না করত যেমনটি তাদের রব তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাহলে তারাই নির্যাতনের শিকার হত এবং অনেক রক্তপাত ঘটতো, ধ্বংসযজ্ঞ সংঘঠিত হতো।

দেখুন, এভাবেই তাওরাতের ব্যাখ্যাকারীরা এসব জাতিকে নির্মূল করার বৈধতা প্রদান করল প্রভুর নির্দেশের নামে। বরং তারা আফসোস করে যে সব জাতিকে ইসরাঈলের তরবারি স্পর্শ করতে পারে নি, তাদের ব্যাপারে!

তাহলে তাওরাতে যা বর্ণিত হয়েছে আর কুরআনে যা এসেছে তার মধ্যে কোথায় সম্পর্ক? পার্থক্যটা কত বিরাট ও বিপরীতধর্মী !

নিকটবর্তী দেশ বা যাকে তারা প্রতিশ্রুত ভূমি বলে অভিহিত করে থাকে সেখানে কোন একজন মানুষকেও জীবন্ত রাখা যাবে না। অর্থাৎ সমূলে ধ্বংস করা হবে। এদেশের সকলকে নির্মূল করা হবে। এজন্যই আশ্চর্যের কোন কারণ নেই যে, ইউরোপীয় খৃষ্টানারা উত্তর আমেরিকায় গিয়ে কি

---

১. দেখুনঃ পবিত্র কিতাব- তাওরাত, সাফারুস তাসনিয়া, অধ্যায়- কুড়িতমঃ ১০-১৮ পৃ. ৩৯২-৩৯৩

করেছিল রেড ইন্ডিয়ানদের নির্মূল করার ক্ষেত্রে, সেদেশের আসল অধিবাসীদেরকে। বৃটিশরা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে কি করেছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আর সেখানকার অধিবাসীদের নির্মূল করেছিল এমন সব পন্থায় যার সাথে নীতি-নৈতিকতার ও মানবতার সামান্যতম সম্পর্কও ছিল না। যদি সেটিকে পশুত্বের সাথে তুলনা করা হয় তাহলেও বিরাট জুলুম করা হবে। কারণ, হিংস্র পশু অন্য প্রাণীকে ততটুকুই হত্যা করে যতটুকু তার খাবারের প্রয়োজন হয়। যখন তার পেট ভরে যায় তখন আর হত্যা করে না। আর এরা হত্যা করে পরিতৃপ্ত হয়না। রক্ত ঝরিয়ে ক্ষান্ত হয় না যদিও তা নদীর স্রোতের মত প্রবাহিত হয়।

জাতি-গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস ও নির্মূল করা "তাওরাতী চিন্তাধারা" যা তাওরাতের পাঠক ইহুদী ও খৃষ্টানরা যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় পেয়ে আসছে। ইসলামে এই চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত। এটি মানবতার ব্যাপারেই শুধু নয়। বরং তা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও, যদি প্রাণীটি কোন এক বিশেষ জাতের হয় (বিরল বা বিপন্ন প্রজাতি) তাহলে সেটিকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে ইসলামের নবী (সা.) বলেনঃ

لَوْلاَ اَنَّ الْكِلاَبَ اُمَّةٌ مِنَ الاُمَمِ لاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا .

"কুকুর যদি প্রাণীকূলের একটি জাত না হত তাহলে আমি তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দিতাম।"[১]

অর্থাৎ তাকে নির্মূল করতে আদেশ দিতেন মানুষকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য।

কিন্তু রাসূল (সা.) বিষয়টিকে গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, তিনি দেখেছেন এই 'কুকুর' কুরআনের দৃষ্টিতে একটি জাতি (উম্মত), তার রয়েছে বিশেষত্ব-বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী যা দ্বারা তাকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা করেছে। আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর বিশেষ হিকমতে, এটা

---

১. আবু দাউদ, কিতাবুস সায়দ, হাদীস নং ২৮৪৫ আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত; তিরমিযী হাদীস নং ১৪৮৯; নাসাঈ হাদীস নং ৪২৮৫; ইবনে মাজা হাদীস নং ৩২০৪। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ। ইমাম আলবানী হাদীসটিকে 'সহীহুল জামেউস সাগীর'-এ সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন (৫৩২১)

যে জানলো সে জানলো, আর যে জানল না সে এ ব্যাপারে অজ্ঞতায় রয়ে গেল। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَطَـائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ - (الأنعام : ٣٨)

"আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী এবং দু'ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি উম্মত (জাতি-প্রজাতি)।" (সূরা আনআম ঃ ৩৮)

এই মহান দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ইসলাম প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বেই সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে- যা আজকের মানবতা ডাক দিচ্ছে এসব প্রাণী-প্রজাতিকে রক্ষা করার জন্য তাদের বিলীন বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া থেকে। যাকে বলা হয়ে থাকে নূহ (আ.)-এর নীতিগত কাজ।[১]

যখন তিনি তাঁর জাহাজে প্রতিটি প্রাণীর জোড়াকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন যেন প্রাণীদের জাতি-প্রজাতি সংরক্ষণ করা যায়, তুফান থেকে যা সবকিছুকে ধ্বংস করবে বলে আশংকা করা হয়েছিল।

দেখুন মানবতার প্রতি ইসলামের কি সুউচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন প্রজাতির জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষী সংরক্ষণের জন্য এবং সেগুলোকে আমাদের মতই উম্মত বা জাতি-প্রজাতি হিসেবে গণ্য করেছে। আপনি তুলনা করুন ইসলামের সুমহান আদর্শের এবং পশ্চিমাদের নিচুতার মাঝে যারা তাওরাতের দীক্ষায় দিক্ষীত হয়ে শিশুসহ তাদের সকল বিরুদ্ধবাদীকে নির্মূল করতে চায়। তাদের বর্বরতার কথা ইতিহাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে।

আমরা দেখেছি ইহুদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের সাথে কি করেছে? তারা বর্বরতম গণহত্যা চালিয়েছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ

---

১. দেখুনঃ লেখকের রচিত গ্রন্থ [আরবী] 'রেয়ায়াতুল বি'য়া ফিশ্‌শারিয়াতিল ইসলামিয়া' অধ্যায়- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, পৃ. ১৫২

বেসামরিক লোকজনকে নির্বিচারে হত্যা করেছে যা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমনটি তারা 'দীরে ইয়াসীন' ও অন্যান্য স্থানে ঘটিয়েছে। তারা গর্ভবতী নারীদের পেট ফেড়ে শিশুকে বের করে আনে এবং এই পৈশাচিক কর্মকান্ড করে উল্লাস প্রকাশ করে। পিতার চোখের সামনে সন্তানকে হত্যা করে, মায়ের সামনে তার কলিজার টুকরাকে হত্যা করেছে, ছেলেমেয়েদের সামনে বাবা মাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। তারা এরূপ পশুত্বমূলক আচরণ করে ফিলিস্তিনীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে তারা ঘরবাড়ি এই রক্তপিপাসু সন্ত্রাসী হায়েনাদের জন্য ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

এই পাপিষ্ঠ রক্তপিপাসুরা তাওরাতের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করে চলেছে যা তারা তাতে পেয়েছে যে, তোমরা সেখানে কোন প্রাণীকে জীবন্ত রাখবে না।

এই হল তাওরাতের বিধান এইসব জাতিগুলোর ব্যাপারেঃ তাদেরকে সমূলে নির্মূল কর, কোন মানুষ যেন বেঁচে না থাকে এভাবেই মুসার প্রভূ তার অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। তাদেরকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে এসব জাতিসত্ত্বাকে নির্মূল করতে। তারা যেন তাদের উপর আক্রমণ শুরু করে, তাদেরকে কোন রকমের ট্যাক্স বা ধর্মান্তরিত হবার কোনই সুযোগ না দেয়। তাদের ভাগ্যে রয়েছে একমাত্র তরবারি।

এই বিধান বাস্তবায়ন করেছেন মুসা,[১] অতঃপর ইউশা এবং দাউদ এই শিক্ষাকে অক্ষরে অক্ষরে। সুতরাং তাঁরা নির্মূল করেছেন জাতিগুলোকে তাদের বংশশুদ্ধ। তারা তাদের বিরোধী লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেন।

---

১. আমরা মুসা (আ.)-এর উপর আরোপিত এই অপরাধ সম্পর্কে তাঁকে পবিত্র বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর হাদীসে এমন কিছুর উল্লেখ নেই যা এসম্পর্কে কোন কিছু প্রমাণ করে। কিন্তু আমরা এখানে উল্লেখ করছি সেই জাতির আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে যা তাদের পবিত্র কিতাবে উল্লেখ রয়েছে এবং এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তাদের স্বভাব-চরিত্র এবং অন্যান্যদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ফুটে উঠছে, প্রতিফলিত হচ্ছে।

তাদের অবস্থা এমনটিই ছিল যেমনটি মহান আল্লাহ্ কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেনঃ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ـ (البقرة : ٧٤)

"অতঃপর তোমাদের অন্তঃকরণসমূহ কঠিন হয়ে যায় পাথরের মত বা তার চেয়েও কঠিন।" (সূরা বাকারা ঃ ৭৪)

তাহলে এটি কোথায় যা কুরআন নিয়ে এসেছে তার তুলনায় মহান আল্লাহ্র এ বাণীতেঃ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج وَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ ـ (البقرة : ١٩٠-١٩١)

"আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তোমাদেরকে বের করেছিল। আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর এবং তোমরা মসজিদুল হারামের নিকট তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে লড়াই করে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯০-১৯১)

কুরআন শত্রুর উপর বাড়াবাড়ি করার অনুমতি দেয়নি যদিও তাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্রোধ রয়েছে, যদিও তারা মুসলমানদের কাবাঘরে

ইবাদত করতে বাধা প্রদান করেছে তবুও। যেমনটি মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেনঃ

وَلاَ يَجْرِمَنَّ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ـ (المائدة : ٢)

"কোন কওমের শত্রুতা যে, তারা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছে, তোমাদেরকে যেন কখনো প্ররোচিত না করে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে।" (সূরা মায়েদা ঃ ২)

এটি কোথায় যা কুরআন নিয়ে এসেছে, মহান আল্লাহর এ বাণীর সাথে কোন তুলনা চলে?

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهُ ـ (التوبة : ٦)

"আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে পৌঁছিয়ে দাও তার নিরাপদ স্থানে।" (সূরা তাওবা ঃ ৬)

এটি কোথায় মহান আল্লাহর বাণীর কাছেঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ وَاِنْ يُرِيْدُوْا اَنْ يَخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ـ (الأنفال : ٦١-٦٢)

"আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা।" (সূরা আনফাল ঃ ৬১-৬২)

ইসলাম যে যুদ্ধের চরিত্র নিয়ে এসেছে তার তুলনা কোথায়? একমাত্র

তাকেই হত্যা করা যাবে যে যুদ্ধ করবে, কোন নারী ও শিশুকে হত্যা করা যাবে না বা বয়োঃবৃদ্ধ কোন লোককে হত্যা করা যাবে না। আর কোন অন্ধ, রোগাক্রান্ত বা ধর্মগুরুকে হত্যা করা যাবে না কিংবা কৃষককে হত্যা করা যাবে না এবং অন্য কোন বেসামরিক লোককে হত্যা করা যাবে না যুদ্ধের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই।

শত্রুর সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীম নির্দেশ দিয়েছেঃ যেন শত্রুদের ঘাড়ের উপর আঘাত করে যার ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের শক্তি খর্ব হয়ে গেলে তারা যুদ্ধ ছেড়ে বন্দী হয়ে পড়বে। বন্দী হওয়ার পর মুসলমানরা তাদেরকে হয় কোনরকমের বিনিময় গ্রহণ ব্যতিরেকে ক্ষমা করে দিবে অথবা বিনিময় গ্রহণ করবে কিংবা তাদেরকে বন্দী করে রাখবে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً ـ

“অতএব তোমরা যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়।” (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪)

এটি কোথায় যা আমরা তাওরাতে পাঠ করলাম, যেখানে বলা হয়েছেঃ “তাদেরকে সমূলে নির্মূল কর।”

ইসলাম শক্তি খর্ব হবার পরই বন্দী ব্যবস্থা রেখেছে, তেমনিভাবে বন্দীর সাথে বন্দী হবার পর উত্তম আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। যেমনটি আমরা দেখতে পাই রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে বদর যুদ্ধের বন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর নেককার বান্দাদের প্রশংসায় বলেনঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ـ

"তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।" (সূরা দাহার ঃ ৮)

মুসলমানদেরকে নিহতদের লাশের উপর প্রতিশোধ নিতে এবং লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করা রয়েছে। রাসূল (সা.) তাঁর সেনাপতিদেরকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন এবং তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশেদাগণ সতর্ক করেছেন।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) যখন তাঁর এক সেনাপতিকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন তখন তাকে সতর্ক করে বলেন, "সাবধান, রাসূলের শহরে (মদীনায়) কোন মৃতদেহ নিয়ে আসবে না।"[১]

তাঁকে যখন বলা হলঃ তারা তো আমাদের নেতার (কমান্ডার বা সেনাপতি) লাশের সাথে এরূপ করে। তিনি বললেন, কি? রোমান ও পারস্যদের নীতির অনুসরণ। আল্লাহর শপথ! আজ থেকে আমার নিকট কোন লাশের মাথা প্রেরণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে চিঠি-পত্র ও সংবাদই যথেষ্ট।[২]

---

১. দেখুনঃ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (৫/৩০৬) বর্ণনা দুটিঃ ৯৭০১, ৯৭০২।

২. সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর সুনান গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন (২৬৩৬); বায়হাকী তাঁর সুনানুল কুবরা গ্রন্থে (৯/১৩২)।

চরমপন্থা ও সন্ত্রাস

চরমপন্থা ও সন্ত্রাস কি একই? না এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে?

অনেকেই এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে এদুটির মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

আমার দৃষ্টিতে এ দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে সাধারণ (আম) ও বিশেষ (খাস) এর মত যেমনটি তর্কশাস্ত্রে বলা হয়ে থাকে। সুতরাং সকল সন্ত্রাসই চরমপন্থা কিন্তু সকল চরমপন্থাই সন্ত্রাস নয়।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই- চরমপন্থা হল: একদল লোক কর্তৃক অপাত্রে (অনুপযুক্ত স্থানে) শক্তি প্রয়োগ কোন রকমের নীতি-নৈতিকতা, শরিয়ত ও আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করেই।

অপাত্রে (অনুপযুক্ত স্থানে) এর অর্থ হল– যেখানে কথার দলিল দিয়ে বা আলোচনা করে বা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সমস্যার সমাধান করা যেত বল প্রয়োগ ব্যতিরেকেই। আর এরা যখন শক্তি প্রয়োগ করে তখন মোটেই দেখে না যে কে মারা গেল? জিজ্ঞেস করে না- তাদের হত্যা করা কি বৈধ? তাকে কোন দিন জিজ্ঞেস করলে সে নিজেকে দেখাবে মুফতী (আইনজ্ঞ), কাজী (বিচারক) এবং পুলিশ হিসেবে। এটিই হল চরমপন্থা যাকে আমরা অপরাধ হিসেবে গণ্য করছি।

কিন্তু সন্ত্রাস হলঃ চরমপন্থা ব্যবহার করা যার সাথে তার কোন বিষয়ই নেই। এটি হল অন্যদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার মাধ্যম এবং তাদেরকে যে কোন উপায়ে দুঃখ-কষ্ট দেয়া এবং তাদেরকে তাদের দাবী-দাওয়া মানতে বাধ্য করা, যদিও তা আপনার দৃষ্টিতে সঠিক বলে মনে হয়।

সন্ত্রাসের মধ্যে গণ্য করা যায়ঃ বিমান ছিনতাই, সাধারণতঃ দেখা যায় ছিনতাইকারী ও যাত্রীদের মাঝে কোন বিষয়ই নেই, তাদের মাঝে আর এদের মধ্যে কোন বিরোধই নেই। এদের কোন একপক্ষকে চাপ দেয়ার জন্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে যেমনঃ সরকারের কোন বিমান ছিনতাই করা বা কোন বেসামরিক বিমান ছিনতাই করে সরকারকে তাদের দাবী-দাওয়া মানতে চাপ দেয়া যেমন হয়তো তাদের কোন বন্দীকে মুক্তির

দাবী করল বা মুক্তিপণ দাবী করল কিংবা এ ধরনের কিছু দাবী করল না হলে বিমানের কোন যাত্রীকে হত্যা করল বা বিমানটিই বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিল।

তেমনিভাবে এর মধ্যে শামিল: পণবন্দী হিসেবে আটক করা, এদেরকে তারাও চিনেনা এবং ওরাও তাদেরকে চিনেনা। কিন্তু তাদের ধরা হয় চাপ সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে যেন তাদের দাবী আদায় করা যায় কিংবা তাদের যাকে ইচ্ছা হত্যা করে যেমনটি ফিলিপাইনে আবু সাইয়াফের গ্রুপ ও অনুরূপ দল ও গ্রুপগুলো করেছে।

তেমনি সন্ত্রাসের মধ্যে গণ্য করা যায়: মিসরে পর্যটকদের হত্যা করা, যেমনটি ঘটিয়েছে 'আল-আকসার' নামক স্থানে পর্যটকদের হত্যাকান্ডের মাধ্যমে মিসরের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য এবং মিসর সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে।

এর মধ্যে রয়েছে: ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে বেসামরিক বিমান যাত্রীসহ ছিনতাই করে এমন সব যাত্রী যাদের মধ্যে ও ছিনতাইকারীদের মধ্যে কোন সমস্যা বা বিরোধ ছিলনা, সেটিকে আক্রমণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে যাত্রীসহ সকলকে বিস্ফোরিত করে দিয়ে আমেরিকার রাজনীতিতে চাপ প্রয়োগ করার লক্ষ্যে।

তেমনিভাবে নিরপরাধ বেসামরিক লোকদেরসহ ওয়াশিংটনের বিশ্ব-বাণিজ্যকেন্দ্র টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে এমন লোকদেরকে যাদের সাথে টাওয়ার ধ্বংসকারীদের কোন সমস্যা বা বিরোধ ছিল না এবং তাদের সাথে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই, এরা সবাই সাধারণ কর্মচারী যারা নিজেদের জীবনধারণের জন্য দৈনন্দিন কর্ম সম্পাদন করছিল, এদের মধ্যে মুসলমানও ছিল।

আমরা সাধারণভাবে চরমপন্থাকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করছি তেমনি বিশেষভাবে আমরা সন্ত্রাসকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করছি। কেননা এতে রয়েছে অন্যের প্রতি জুলুম ও বাড়াবাড়ি করা যাদের এমন সামান্যতম কোন অপরাধ নেই যার জন্য তাদেরকে পাকড়াও করা যেতে পারে।

কুরআন মজীদ ও অন্যান্য আসমানী কিতাবগুলোতে[১] যে মূলনীতি এসেছে তা হলঃ

"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।" (সূরা নাজম ঃ ৩৮)

কেননা এর দ্বারা নিরাপদ নিরপরাধ লোকজনকে আতঙ্কিত করা হয় আর ইসলামের দৃষ্টিতে কাউকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত করা বিরাট জুলুম।

আমি বেশ কয়েক বছর পূর্বে ফতওয়া প্রদান করেছিঃ বিমান ছিনতাই করা হারাম বলে। সেটি ছিল কুয়েতী বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনার পর। এ ঘটনায় যাত্রীদেরকে ষোল দিন পর্যন্ত পণবন্দী করে রাখে এদের একজন বা দু'জনকে হত্যাও করে।

তেমনিভাবে আমি ফতওয়া প্রদান করেছি পণবন্দী হিসেবে কাউকে আটক করা এবং তাকে হত্যার হুমকি দেয়া হারাম। এটি আমি দিয়েছিলাম ফিলিপাইনে আবু সাইয়াফ গ্রুপের লোকদের কর্মকাণ্ডকে প্রত্যাখ্যান করে। এসব পণবন্দীদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু ভাগ্যের লিখনে তারা এদের হাতে বন্দী হয়েছে।

আমি তেমনিভাবে বিবৃতি দিয়েছি এগারই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর। এতে আমি এই কর্মকাণ্ডকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছি, তাদের ধর্ম যাই হোক না কেন, তাদের জাতীয়তা যা-ই হোকনা কেন এবং তারা যে দেশেরই অধিবাসী হোক না কেন।

এটি আমার একার ব্যক্তিগত অভিমত নয়। আমি ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও নীতি থেকেই, কুরআন-হাদীস ও ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানের আলোকেই এই অভিমত ব্যক্ত করেছি। আমি এ ক্ষেত্রে সকল মাযহাব ও দলমতনির্বিশেষে সকলের অভিপ্রায়, অভিমতকে সামনে রেখেই ফতওয়া-বিবৃতি প্রদান করেছি।

---

১. মহান আল্লাহ বলেনঃ "নাকি মুসার কিতাবে যা আছে, সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়নি? আর ইবরাহীমের কিতাবে, যে (নির্দেশ) পূর্ণ করেছিল। তা এই যে, কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।" (সূরা নজম ঃ ৩৬-৩৮)

জিহাদ ও চরমপন্থার মাঝে

এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী যে, সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য বিধান করবো ইসলামে যে জিহাদ ফরজ করেছে দীনের প্রতিরোধ কল্পে বা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে কিংবা ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করতে এবং চরমপন্থার মাঝে যাকে আমরা নিন্দা, ঘৃণা এবং প্রত্যাখ্যান করি।

জিহাদ ও চরমপন্থা প্রতিটিতেই উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু জিহাদ তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং মাধ্যমের ব্যাপারে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জিহাদ সর্বদা শরীয়তের বিধি-বিধান এবং ইসলামে বর্ণিত নৈতিক-চরিত্রে অনুসরণ করে থাকেঃ যুদ্ধের পূর্বে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং যুদ্ধের পরে।

কিন্তু চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি যেমনটি করছে কতিপয় ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত গ্রুপ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়, তা তাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বা মাধ্যমের ক্ষেত্রে কিংবা শরীয়তের বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে, সাধারণত এটি করে থাকে আবেগপ্রবণ যুবকরা, যাদের শরীয়তের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং বাস্তব জ্ঞানের ও বাস্তবতা উপলব্ধি করার মত দূরদৃষ্টির অভাব রয়েছে আর তাদের মাঝে আবেগপ্রবণতাই অধিক। তারা জীবনকে ও মানুষকে কাল চোখে দেখে থাকে, এজন্য তাদের মধ্যে খারাপ ধারণা বদ্ধমূল থাকে যারফলে অন্যকে ফাসেক এমনকি সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত বলতে দ্বিধা করে না। আর সুস্পষ্ট কুফরী মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

জিহাদ শক্তি প্রয়োগ করে থাকে তার স্বস্থানে, সময়মত এবং প্রয়োজন মাফিক, সেই শত্রুদের সাথে যারা শত্রুতা করেছে ইসলামের সাথে, ইসলামের অনুসারীদের সাথে। তাদেরকে তাদের দীনের ব্যাপারে ফিতনায় ফেলেছে বা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে কিংবা দুর্বলদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন করেছে এবং তাদের অধিকার বিনষ্ট করেছে কিংবা তাদের ভূমি জবরদখল করেছে, তাদের ইজ্জত-আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ করেছে, তাদের পবিত্র স্থানসমূহকে পদানত করেছে সুতরাং এক্ষেত্রে জিহাদ করার বৈধতা রয়েছে মহান আল্লাহর এই বাণীর প্রতি আমল করেঃ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ

اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ - (البقرة : ١٩٠)

"আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯০)

ফিলিস্তীনে জিহাদের বৈধতা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হল ফিলিস্তীনকে মুক্ত করার জিহাদ, ইসরা ও মিরাজের পবিত্র ভূমি, আল-আকসা মসজিদের ভূমি যা মুসলমানদের প্রথম কিবলা এবং তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ। যেই মসজিদকে মসজিদে হারামের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যেখান থেকেই ইসরার শুরু এবং যেখানে এসেই ইসরার পরিসমাপ্তি।

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الاَقْصَا الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ - (الاسراء : ١)

"পবিত্র মহান সে সত্তা. যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল-মাসজিদুল হারাম (কাবাঘর) থেকে আল-মাসজিদুল আকসা (বায়তুলমুকাদ্দাস মসজিদ) পর্যন্ত। যার আশে-পাশে আমি বরকত দিয়েছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১)

এই পবিত্র ভূমি আজ জঘন্য ধরনের আগ্রাসনে নিপতিত, মারাত্মক সাম্রাজ্যবাদের হাতে বন্দী, সে সাম্রাজ্যবাদ হল ইহুদী যায়নবাদী, আগ্রাসী, বর্ণবাদী, সন্ত্রাসী, গ্রাসকারী, বসতিস্থাপনকারী, পশু উপনিবেশবাদী।[১] এই উপনিবেশবাদে কোন মানুষের সামান্যতম মূল্য নেই, সে কোন মুমিনের প্রতি কোন মান-সম্মান দেখায় না, তার আচরণে কোন দয়ামায়ার বিন্দুমাত্র লেশ নেই।

---

১. এই উপনিবেশবাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের 'জেরুজালেম বিশ্বমুসলিম সমস্যা', আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত বইটি পাঠ করুন।

এই উপনিবেশবাদ এক রক্তাক্ত, চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি পশুত্ব কর্মকান্ড করে এমন এক অঞ্চলকে কুক্ষিগত করেছে যার উপর তার শতবছর পূর্বেও কোন উপস্থিতি ছিল না। শক্তি, ষড়যন্ত্র ও পশ্চিমাদের সাহায্যে- প্রথমে বৃটেন এবং পরবর্তীতে আমেরিকা- এর অধিবাসীদের উপর চড়াও হয়েছে এবং তাদেরকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাদেরকে জোর করে উচ্ছেদ করছে।

ইসলামী বিধানে (ফিকহ) এটি সুবিদিত যে, ফিলিস্তীনের জন্য মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধভাবে এবং একাকী বের হতে হবে কাফের শত্রুকে বিতাড়নের জন্য, যারা বাড়িঘর জবরদখল করেছে। একারণেই তাদের সবার উপর ফরজে আইন (প্রত্যেকের উপর অপরিহার্য) হয়ে পড়েছে যার যা সামর্থ্য আছে তা দিয়ে জিহাদ করবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির যে হক রয়েছে সেটিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে– স্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতিতে, সন্তান পিতার অনুমতি ব্যতিরেকেই, দাস মুনিবের অনুমতি ছাড়াই জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। কেননা সমষ্টির (জামায়াতের) বাঁচার অধিকারকে ব্যক্তি অধিকার স্বামী, পিতা মুনিবের উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

যদি ফিলিস্তীনের অধিবাসীরা ভূমি উদ্ধারে অক্ষম-অপারগ হয়, তারা হয়তো অলসতা করলে বা কাপুরুষতা প্রদর্শন করলে এর আশে-পাশের লোকজনের উপর ফরজ হয়ে যাবে লড়াই করার, তারাই তখন ওদের হয়ে জিহাদ করে ফিলিস্তীনকে মুক্ত করবে, শত্রুদেরকে বিতাড়িত করবে। যদি এর প্রতিবেশীরাও বসে পড়ে শত্রুর মোকাবিলা না করে -যেমন বর্তমান অবস্থা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর- তাহলে এর পরবর্তীদের উপর অতঃপর তাদের পরে যারা রয়েছে এরপর সমস্ত মুসলমানদের উপর ফরয হবে ফিলিস্তীনকে কাফের-ইহুদীদের দখল মুক্ত করা।

এটিই শরীয়তের বিধানে অপরিহার্য (ফরয) করা হয়েছে, ইসলামী মাজহাবের সকল দলই এই ফতওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য।

ফিলিস্তীনের ক্ষেত্রে এটাই বাস্তবতা। ফিলিস্তিনীরা তাদের সবকিছু খরচ করেছে, চমকপ্রদ বীরত্ব দেখিয়েছে, আত্মঘাতী শহীদী হামলা চালিয়েছে, শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জে, শিবিরে, তাঁবুতে চরম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে,

প্রশংসনীয় আক্রমণ পরিচালনা করেছে যদিও তাদের অস্ত্র, রসদ অপ্রতুল। যদিও তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে শত্রুরা ট্যাংক, সাজোয়া যান, বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে, আবাদী জমিনকে বিরান করে, শস্যক্ষেতকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, গাছ-পালা উপড়িয়ে ফেলেছে, তাদেরকে ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে, তাদের উপর অবরোধ চাপিয়ে তাদেরকে ক্ষুধা-দারিদ্রতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে যেন তারা ইহুদী যায়নবাদীদের কাছে মাথা নত করে। এতদসত্ত্বেও এই জাতি দমে যায়নি, তারা শত্রুর সামনে মাথানত করেনি, তারা পিছুটান দেয়নি। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে, ফিলিস্তিনীদের শক্তিসামর্থ্য দ্বারা মহাপরাক্রমশালী ইসরাইলকে রুখা যায়নি, যে ইসরাইল আজ বিশ্বের ভয়ংকর অস্ত্রধারী রাষ্ট্রের তালিকায় রয়েছে, তার অস্ত্রভান্ডারে রয়েছে পারমানবিক অস্ত্র। আরব রাষ্ট্রগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যেন তারা পারমানবিক অস্ত্রের অধিকারী না হতে পারে।

এখানে এসেই জিহাদের ফরজিয়াত প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর এসে বর্তাচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ফিলিস্তীনের আশেপাশের লোকজন সম্পূর্ণভাবে এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এমনকি তারা জিহাদকে পরিত্যাগ করে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছে। তারা ফিলিস্তিনীদের একা ছেড়ে দিয়েছে। যে ফিলিস্তিনীরা তাদের সীমিত সামর্থ্য-শক্তি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র যাকে স্বয়ং বিশ্বের পরাশক্তি আমেরিকা সাহায্য করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। আরবরা যখন ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তখন সদ্যপ্রসূত -তিন বছর বয়সী- আরব লীগ ফিলিস্তিনীদের হাতে এ ব্যাপারে কোন দায়িত্বই দেয় নি।

এখানে এসে জিহাদের দায়িত্ব এসে পড়েছে বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর। তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হল তারা একাকী ও একতাবদ্ধভাবে তাদের জানমাল নিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাদের যার যা সামর্থ্য রয়েছে তা নিয়েই।

বিশ্বের সকল প্রান্তের মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হয়ে পড়ে যদি

ইসলামের কোন পবিত্র ভূমি কাফের দখলদার বাহিনীর কবলে পড়ে তাহলে তাকে উদ্ধার করা। আর সেটা যদি তাদের প্রথম কিবলা, ইসরা ও মেরাজের ভূমি মসজিদুল আকসা হয়?

এখন মুসলিম উম্মার উপর ওয়াজিব হয়ে পড়েছে মসজিদুল আকসাকে উদ্ধার করা। মুসলিম উম্মার সকল জনশক্তি তাদের সরকারের উপর যথাসম্ভব চাপ প্রয়োগ করবে- সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দানের অংশ হিসেবে- আলেম-উলামা, লেখক-বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক-সাহিত্যিক যার যা সামর্থ্য রয়েছে তা দিয়েই হকের কথা বলবে যেন শেষাবধি সরকারগুলো তাদের ডাকে সাড়া দেয়, কেননা তারা তাদের জাতির দাবী-দাওয়াকে উপেক্ষা করতে পারে না, তাদের থেকে বিচ্ছিন্নও হতে পারবে না। নিদেনপক্ষে সেসব লোকদের জন্য সুযোগ করে দেবে যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করে শহীদ হতে আগ্রহী। এই উম্মতের একদল মর্দে-মুজাহিদ হকের উপর অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আল্লাহর ফয়সালা অবশ্যই আসবে। শেষ পর্যন্ত উম্মতের সর্বশেষ এ দলটি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

মুসলিম উম্মাহ গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সেইসব স্বাধীনচেতা লোকদের যারা উম্মতে মুহাম্মদীকে জিহাদে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবে, তাদের প্রবল কামনা-বাসনার জিহাদে সকলকে সংগঠিত করবে। যেমনটি ইতোপূর্বে করেছিলেন- ইমাদুদ্দিন জঙ্গী এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী পুত্র শহীদ নুরুদ্দীন মাহমুদ এবং তাঁর অন্যতম শিষ্য সালাহউদ্দীন আইউবী, যার হাতেই আল্লাহ্ প্রথম বিজয় এনে দেন।

এই জিহাদ নিঃসন্দেহে বৈধ, বরং ফরজ বিশেষ করে ফিলিস্তিনী জনগণের উপর এবং সাধারণভাবে মুসলিম জনগণের উপর। তারা গুনাহগার হবে যদি তারা তাদের এই দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করে বা গাফলতি করে।

ফিলিস্তীনে শাহাদাত উজ্জীবিত হামলা আজকের দিনে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জিহাদ

আজকে ফিলিস্তীনের বিভিন্ন গেরিলা গ্রুপ যে শাহাদাত উজ্জীবিত হামলা পরিচালনা করছে দখলদার ইহুদী যায়নবাদীদের বিরুদ্ধে তা কোন অবস্থাতেই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী আক্রমণের মধ্যে পড়ে না, যদিও এর দ্বারা কিছু কিছু বেসামরিক মানুষের জীবনহানী ঘটে থাকে। এর কারণ হলঃ

প্রথমতঃ ইসরাইলী সমাজ যা গঠিত হয়েছে দখলদার সাম্রাজ্যবাদী, বর্ণবাদী, সামরিক ধর্মান্ধ জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে যারা মূলত সামরিক জনগোষ্ঠী বেসামরিক ছদ্মাবরণে। অর্থাৎ ইসরাঈলের প্রতিটি জনগণই শিশু বয়স পার হলেই ইসরাইলী সামরিক বাহিনীর বাধ্যতামূলক সদস্য হয়ে যায়, সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এজন্যই ইসরাইলের প্রতিটি নাগরিকই হয়ত বাস্তবেই সরাসরি সৈনিক বা সৈনিক শক্তি হিসেবে, আমরা একে অতিরিক্ত সৈনিক হিসেবে গণ্য করতে পারি। যাকে যেকোন মুহূর্তে ডাকা যাবে যুদ্ধের জন্য। আর এটিই বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যার জন্য কোন প্রমাণ-পঞ্জির প্রয়োজন পড়ে না। এদের যাদেরকে বলা হয়ে থাকে বেসামরিক তারা বাস্তবেই সামরিক বিভাগেরই লোক সে পুরুষ হোক বা নারী বিশেষ করে নতুন জনবসতির লোকজন যা মূলত সামরিক ঘাটির নামান্তর।

দ্বিতীয়তঃ ইসরাঈলী সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা দ্বারা তাকে অন্যান্য মানব সমাজ থেকে পৃথক করে তারা হল আক্রমণকারী -ফিলিস্তিনীদের ক্ষেত্রে- গোষ্ঠী বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ করে আমেরিকা, ইউরোপ ও রাশিয়া ও প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। তারা এসে সেখানকার অধিবাসীদেরকে উৎখাত করে বসতি গড়ে তুলছে, তাদেরকে জিম্মী করে ঘরবাড়ী ধ্বংস করে দখল করে নিচ্ছে। অধিবাসীদের এই অধিকার রয়েছে তারা যেভাবেই পারবে এই দখলদার বাহিনীকে বিতাড়ন করে নিজেদের ভূমি উদ্ধার করবে। তারা ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জিহাদে লিপ্ত হবে, জিহাদে নামতে বাধ্য

যে জিহাদকে ফিকহ্-এর ভাষায় বলা হয় জিহাদে ইদতেরার, প্রতিরোধ জিহাদ, আক্রমণ জিহাদ নয়। এতে নারী, পুরুষ, শিশু কে মারা গেল তা ধর্তব্যের বিষয় নয়। কারণ, এরা মারা পড়ছে অনিচ্ছাকৃতভাবে, যুদ্ধেরই প্রয়োজনে।

সময়ের পরিবর্তনেও যায়নবাদী ইহুদীদের সাম্রাজ্যদাবী দখলদারী গুণের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সময় বয়ে গেলেও বাস্তবতা অভিন্ন রয়েছে, তারা নির্বিচারে হত্যা, অপহরণ, গুম, দখলদারী, ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠন বন্ধ করেনি। এদের বেসামরিক পোষাক এদের জঘন্য চিত্রকে লুকাতে পারেনি। যাদেরকে মহান আল্লাহ অত্যাচারী, সীমালংঘনকারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। "সাবধান! জালেম-অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।" (হুদ ঃ ১৮)

তৃতীয়তঃ যে ইসলামী শরিয়তের আমরা অনুসারী- যা আমাদের সর্বক্ষেত্রে পালনীয়, সেই শরীয়তে অমুসলিমদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে দুই ভাগেঃ শান্তিকামী এবং যুদ্ধবাজ। যারা শান্তিকামী তাদের ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য আমরা তাদের সাথে সহাবস্থান করব, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করব। আর যারা যুদ্ধবাজ বা যুদ্ধরত তাদের ব্যাপারে কর্তব্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তাদের শত্রুতার জবাব শত্রুতা দিয়েই দিতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا ط اِنَّ
اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ
وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج
وَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ ج
فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ط كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ ـ فَاِنِ
انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ
وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى

الظّٰلِمِيْنَ ـ (البقرة : ١٩٠-١٩٣)

"আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তোমাদেরকে বের করেছিল। আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর এবং তোমরা মসজিদুল হারামের নিকট তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে লড়াই করে। অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তাদেরকে হত্যা কর। এটাই কাফেরদের প্রতিদান। তবে যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে জালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯০-১৯৩)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

لاَ يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقٰتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ (الممتحنة : ٨-٩)

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল

তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে ও তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো জালিম।" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ৮-৯)

সুতরাং প্রথম প্রকার হল শান্তিকামী, তাদের সাথে মুসলমানদেরকে অবশ্যই ভাল এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যবহার করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের হল প্রথম প্রকারের উল্টোটি যে যুদ্ধবাজ বা যুদ্ধে লিপ্ত যাদেরকে ফকিহরা বলেন, হারবী বা যুদ্ধরত বা যাদের সাথে যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। এদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে বিশেষ বিধি-বিধান রয়েছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে একজন হারবী বা যুদ্ধবাজের সম্পদ নিরাপদ নয়। তার শত্রুতার কারণে মুসলমানদের উপর থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা তিরোহিত হয়ে গেছে।

চতুর্থতঃ এ বিষয়টিকে আরো বলিষ্ঠ করেছে এ জন্য যে, সমস্ত ফকিহগণ একমত হয়েছেন বা অধিকাংশ ফকিহ একমত যে যদি তারা মুসলমানদেরকে মানব ঢাল হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে এক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে হত্যা করা জায়েয হবে। শত্রু যদি মুসলমানদেরকে মানবঢাল হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে সামনে রাখে তাহলে ফকিহরা জায়েয বলে ফতওয়া দিয়েছেন যে, এক্ষেত্রে নিরপরাধ মুসলমানদেরকে হত্যা করা যাবে যদি তাদেরকে হত্যা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর না থাকে বা কোন বিকল্প না থাকে। যদি তাদের সমেত হত্যা না করে এগিয়ে না যায় তাহলে আক্রমণকারী শত্রু এসে তাদেরকেই হত্যা করবে, তাদের ঘর-বাড়ি, ফসল-পানি জ্বালিয়ে দিবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কতিপয় লোককে কোরবানী দিতেই হবে, সকলকে হেফাজত ও নিরাপদ রাখার স্বার্থেই। আর এটি হল ভাল এবং মন্দের মাঝে অল্প মন্দের দ্বারা অধিক ভাল অর্জন করা।

যখন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করা জায়েয বৃহত্তর স্বার্থে তখন

অমুসলিমদেরকে হত্যা করা জায়েয হবে মুসলমানদের দখলকৃত ভূমি উদ্ধারের জন্য যা জবরদখল করেছে শত্রুরা।

পঞ্চমতঃ বর্তমান কালের যুদ্ধে সমাজের প্রত্যেকেই এর যোদ্ধা, সকলেই এই যুদ্ধের সৈনিক যেন সকলেই এই যুদ্ধে জড়িত এবং এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করছে এবং সকলেই এতে রসদ সরবরাহ করছে অর্থ দিয়ে মানব সম্পদ দিয়ে, যেন যুদ্ধরত রাষ্ট্রটি বিজয় লাভ করতে পারে। এতে প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব রয়েছে যে যেখানে রয়েছে সেখান থেকেই যুদ্ধের রসদ জোগাবে ভিতর থেকে বাইরে থেকে- যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে রয়েছে তারা আর যারা অস্ত্র বহন করছে না তারাও এর যোদ্ধা। এ জন্য বিশেষজ্ঞরা বলেনঃ যায়নবাদী ইহুদীরা (ইসরাইলীরা) বাস্তবে সবাই সৈনিক।

ষষ্ঠতঃ বিধি-বিধান দুই প্রকারের- ভাল এবং প্রশস্ততার সময়ে বিধি-বিধান এবং সংকট ও বিপদকালীন বিধি-বিধান। একজন মুসলমানের জন্য বিপদকালীন সময়ে যা জায়েয তা অন্য সময় জায়েয নয়। এ জন্য মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে চার জায়গাতে হারাম করেছেন– মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়ে থাকে। অতঃপর বলেনঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (البقرة : ١٧٣)

"সুতরাং যে বাধ্য হবে, অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৩)

এখান থেকেই ইসলামী আইনজ্ঞরা (ফকিহগণ) বিশেষ সূত্র (কায়েদা) গ্রহণ করেছেনঃ (الضرورات تبيح المحظورات) "অতীব প্রয়োজন [জরুরাত] হারামকে বৈধ করে দেয়।" আমাদের ফিলিস্তিনী ভাইয়েরা নিঃসন্দেহে জরুরী অবস্থার মধ্যে রয়েছে। বরং এটিই খুবই সংকটাপন্ন জরুরাত এই শাহাদাত উজ্জীবিতী আক্রমণ চালানোর জন্য যেন শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা

যায় যে শত্রু অন্যায়ভাবে দেশকে দখল করে রয়েছে, জনগণের মাঝে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না, তাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করছে। যদি এই শহীদী হামলা না চালানো হত তাহলে এতদিনে তাদেরকে ইসরাইল যা চায় তাই দিতে বাধ্য হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না।

যদি তাদেরকে ইসরাইলের হাতে যে ট্যাঙ্ক, সাজোয়া বহর, ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধবিমান, নৌ যুদ্ধ জাহাজ এবং অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে এর একশভাগের একভাগও ফিলিস্তিনীদেরকে দেয়া হত তখন অবশ্যই তারা এই শহীদী আত্মঘাতী হামলা পরিত্যাগ করত। তাদের কাছে এমন কোন অস্ত্র নেই যা দ্বারা তারা এই চরম ঔদ্ধত্য মহাপরাক্রমশালী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাদের এই অতি নগণ্য অস্ত্র হল 'মানব বোমা' যা কোন যুবক বা যুবতী বহন করছে নিজের জীবনের বিনিময়ে যা শত্রুর মাঝে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। আর একমাত্র এই অস্ত্রই শত্রুর হাতে নেই- যার অস্ত্র ভান্ডারকে আমেরিকা সবধরনের অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করেছে। এটি এক বিশেষ অস্ত্র যার মালিক হল আল্লাহর প্রতি পাক্কা ঈমানদার ব্যক্তিগণ। আর এটি মহান আল্লাহর এক কুদরতী প্রতিরোধ ও ইনসাফপূর্ণ প্রতিরোধ যা প্রকৃত জ্ঞানীজনই উপলব্ধি করতে পারেন। এটি হল অতীব দুর্বল অসহায়ের অস্ত্র চরম পরাক্রমশালী ঔদ্ধত্যপূর্ণ শত্রুর বিরুদ্ধে। "আর তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।" (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৩১)

বিপক্ষ অভিমতপোষণকারীদের সংশয়ের জবাব

যারা শাহাদাত উজ্জীবিত হামলার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন তারা তিনটি কারণে সংশয়-সন্দেহ পেশ করেনঃ

১. এটি আত্মহত্যার মধ্যে পড়ে এবং নিজেকে ধ্বংস করার মধ্যে শামিল হবে। আর ইসলামে আত্মহনন করা কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ।

২. এর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই এমন সব বেসামরিক লোকজন আক্রান্ত হন যারা কখনও যুদ্ধে অংশগ্রহণই করে না যেমন নারী, শিশু ইত্যাদি। এদেরকে হত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ এমনকি শত্রুর সাথে সম্মুখ সমরের

সময়ও, এমনকি সেসব বেসামরিক লোককেও হত্যা করা বৈধ নয় যারা অস্ত্র বহন করে না।

৩. এর দ্বারা ফিলিস্তিনীরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে শত্রুর পক্ষ থেকে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করার কারণে। আত্মঘাতী হামলার পর ইসরাইল চরম বর্বরোচিত পাল্টা আক্রমণ চালায় ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে, ইজ্জত-আব্রু বিনষ্ট করে। যদিও শরীয়তে এ বিষয়টি বৈধ করা হয়েছে কিন্তু এর ফলাফল পর্যালোচনা করে এটি নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত।

ফিলিস্তীনে শাহাদাত উজ্জীবিত হামলা কোনক্রমেই আত্মহনন নয়

যারা শাহাদাত উজ্জীবিত হামলার বিরোধিতা করেন এই বলে যে, এটি এক প্রকারের আত্মহনন বা নিজের জীবন হত্যা করা তারা বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। কেননা আত্মহনন ও শাহাদাতের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। অপর দিকে– যে ব্যক্তি শহীদী আত্মঘাতী এবং আত্মহননের বিষয়টি বিশ্লেষণ করবে সে অবশ্যই এ দুটির মাঝে বিস্তর ফারাক পাবে।

একজন আত্মহননকারী নিজের আত্মাকে নিজের জন্যই খুন করছে। কোন বঞ্চনার কারণে বা কোন আবেগ তাড়িত হয়ে কিংবা পরিস্থিতিকে সামাল দিতে না পেরে বা অন্য কোন কারণে, এর ফলে সে জীবনকে বিলীন করে দিচ্ছে মৃত্যুর মাধ্যমে।

আর শহীদী-হামলাকারী নিজের প্রতি দেখে না। সে দেখে এক বিরাট বিষয়ের দিকে যার জন্য সে নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগে এগিয়ে আসে, সে নিজের আত্মাকে আল্লাহর নিকট বিক্রি করে দেয় জান্নাতের বিনিময়ে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ (التوبة : ١١١)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।" (সূরা তাওবা ঃ ১১১)

আত্মহননকারী মারা যাচ্ছে (জীবন থেকে কাপুরুষের মত) পলায়নপর হয়ে, পক্ষান্তরে শহীদী হামলাকারী মারা যাচ্ছে (বীবের মত) আক্রমণকারী হিসেবে।

আত্মহননকারীর জীবন থেকে পালানো ছাড়া কোন উদ্দেশ্যই নেই পক্ষান্তরে শহীদী হামলাকারীর উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট তা হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ - (البقرة : ٢٠٧)

"আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। আর আল্লাহ্ তার বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।" (সূরা বাকারা ঃ ২০৭)

বেসামরিক লোকজন আক্রান্ত হওয়া

বেসামরিক নারী, শিশু, বৃদ্ধ, কর্মচারী, শ্রমিক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন আক্রান্ত হচ্ছে যারা অস্ত্র বহন করে না বলে যে সংশয়-সন্দেহ পেশ করা হয়ে থাকে সে ব্যাপারে ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে ইসরাইলী সমাজ পুরোটাই সামরিক সমাজ এরা আক্রমণকারী... এদের মধ্যে কেউ বেসামরিক লোকই নেই, সে লেখাগুলো দয়া করে আবার পাঠ করুন।

আর শিশু- আত্মঘাতী কর্তৃক শিশুদের হত্যা করার কোন পরিকল্পনাই নেই কিন্তু তা আনুষঙ্গিকভাবে ঘটে যায় এবং সেটি জরুরাতের মধ্যে গণ্য। আর একথা সবার জানা রয়েছে যে, জরুরাতের কারণে নিষিদ্ধ কাজও বৈধতা লাভ করে থাকে এবং ওয়াজিবাতও রহিত হয়ে যায়।

ফিলিস্তিনীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

আর ফিলিস্তিনীরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে যে শাহাদাত উজ্জীবিত হামলার পর তাদের উপর ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা, জ্বালাও পোড়াও নেমে আসে, সে ব্যাপারে কথা হল ইসরাইলের হাত অনেক বড়, তার শক্তি-সামর্থ্য অনেক বেশী। সে একের পরিবর্তে দ্বিগুণ বরং দশগুণ প্রতিশোধ নিয়ে থাকে।

আমরা এখানে কতিপয় জবাব উল্লেখ করবঃ

প্রথমতঃ ইসলরাইলই এখন পর্যন্ত সবসময় প্রথমেই আক্রমণ করে এসেছে। প্রতিরোধের কারণে সে এখন নিজের প্রতিরক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। একথা সবার নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট যে, পৃথিবীর বুকে সেই একমাত্র রাষ্ট্র যে অন্যের ভূমি জবরদখল করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে। ফিলিস্তিনীরা নিজেদের দখল হয়ে যাওয়া দেশকে মুক্ত করার জন্য আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

দ্বিতীয়তঃ শত্রুতা করাই ইসরাইলের প্রকৃতি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত। বরং সে প্রতিষ্ঠাই পেয়েছে হত্যা, সন্ত্রাস, রক্ত প্রবাহিত করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে, অন্যের ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠন করার মাধ্যমে। তার স্বভাব প্রকৃতি মোটেও পাল্টায় নি। যদি ফিলিস্তিনীরা তাদের এই অতি নগণ্য অস্ত্র ব্যবহার না করে চোখ বন্ধ করে থাকে তাহলে ইসরাইল তার হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা অব্যাহতভাবে চালিয়েই যাবে।

তৃতীয়তঃ আমরা যেন ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলের পাল্টাআক্রমণকে খুব বড় করে না দেখি এবং শহীদী আত্মঘাতী হামলার ফলে ইসরাইলের উপর ফলাফল সম্পর্কে বেখবর না হই। এরফলে তাদের মধ্যে যে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের ভবিষ্যত স্থিতিশীলতার উপর যে বিরাট প্রভাব পড়েছে অনেকেই দেশত্যাগ করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছে এবং অনেকেই বাস্তবে ইসরাইল ছেড়ে পালিয়েছে। এছাড়া এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পর্যটন শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে কি বিরাট প্রভাব পড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ কারণে ইসরাইল ও আমেরিকা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যেন যেকোন

মূল্যে এই আত্মঘাতী হামলা বন্ধ করা যায়। এরমধ্যে ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করা যে কোন মূল্যে যেন এই প্রতিরোধকে উৎখাত করা যায় সন্ত্রাসের দোহাই দিয়ে।

আমরা যদিও ব্যথা ও মনোকষ্টে ভুগছি, সে কিন্ত্র আমাদের চেয়েও বেশী ভুগছে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

اِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لاَ يَرْجُوْنَ - (النساء : ١٠٤)

"যদি তোমরা ব্যথা পেয়ে থাক তাহলে তারাও তো ব্যথা পাচ্ছে, যেভাবে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছ। আর তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আশা করছ যা তারা আশা করছে না।" (সূরা নিসা ঃ ১০৪)

ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় চরমপন্থী দল ও গ্রুপ

সম্প্রতি বিগত কয়েক দশকে কতিপয় আরব ও মুসলিম দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেঃ ইসলামী প্রতিরোধ দল গঠন করার ক্ষেত্রে, যারা নিজেদের নাম দিয়েছে "জিহাদী দল"। তারা জিহাদ বলতে প্রথমতঃ বুঝাতে চায়- সেই সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে যারা মুসলিম উম্মাকে শাসন করছে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত আইনের দ্বারা অথচ মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন সর্বক্ষেত্রে তাঁর দেয়া বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করতে হবে- তা দীনী বিষয় হোক যেমন ইবাদত বা দুনিয়াবী বিষয়ই হোক যেমন মুয়ামালাত (পারস্পরিক লেন-দেন ইত্যাদি)। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ - (البقرة : ١٨٣)

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ - (البقرة : ١٧٨)

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর কিসাস ফরজ করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৮)

অতএব রোযার মতই কিসাসের বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে, কারণ উভয়টিই ফরজ।

মহান আল্লাহ সূরা মায়েদায় ইরশাদ করেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلوٰةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ - (المائدة : ٦)

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযে দন্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর।" (সূরা মায়েদা ঃ ৬)

মহান আল্লাহ উক্ত সূরাতে আরো ইরশাদ করেনঃ

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - (المائدة : ٣٨)

"আর পুরুষ চোর এবং নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আজাব স্বরূপ এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মায়েদা ঃ ৩৮)

আমরা কেন পাক-পবিত্রতার আয়াতকে মানছি আর চুরির বিধানের আয়াতকে ফ্রিজ করে রাখছি? অথচ দুটি আয়াতই মহান আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে আমাদের নিকট এসেছে!

মিসর, আলজিরিয়া সহ অন্যান্য দেশে জিহাদী সংগঠনগুলো অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে, বরং তাদের দৃষ্টিতে কাফের শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে, এদের সাথে ওয়াজ, নসিহত ও আলাপ-আলোচনার পথ ব্যর্থ হবার পর। তারা এদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ ও চরমপন্থা ছাড়া আর অন্য কোন পথই খুঁজে পায়নি। তারা বলেঃ এসব শাসকদের সাথে

আলাপ-আলোচনা করে যদি কোন লাভ হত তাহলে অবশ্যই আমরা আলাপ-আলোচনা করতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হল তরবারির মোকাবিলা কলম দ্বারা করা যায় না এবং অস্ত্রের ভাষার বিরুদ্ধে মুখের ভাষায় কোন কাজ হয় না।

চরমপন্থী গ্রুপসমূহের মোকাবেলা করার পন্থা

অনেকেই "চরমপন্থার উত্থানের" বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা এবং গবেষণা করেছেন এবং এর প্রতিকারের বিষয়েও কথা বলেছেন।

এসব গবেষণা দ্বারা একথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, শুধুমাত্র মুসলিম দেশগুলোতেই চরমপন্থার উত্থান ঘটেনি বরং এটির উত্থান বিশ্বব্যাপী। খোদ আমেরিকাতেও বর্তমানে এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। ইউরোপে (বৃটেন, ইতালী, স্পেন) এবং এশিয়াতে (ভারত, জাপান এবং স্বয়ং ইসরাইলে) এর অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে।

আমাদের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল- আমরা আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে কিভাবে এর মোকাবিলা করব বিশেষ করে বিভিন্ন কারণে এর শিকড় অনেক গভীরে পৌঁছে গেছে, তন্মধ্যে আমাদের দেশগুলোতে পরাশক্তির চরম জুলুম ও নির্যাতন। এরমধ্যে অন্যতম হল ফিলিস্তীন সমস্যার ব্যাপারে, এমন এক জাতির সমস্যা যাদের ভূমিকে জবরদখল করে নেয়া হয়েছে, যাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছে, তাদের উপর ভিতর-বাহির সবদিক থেকে চাপ প্রয়োগ করে দখলদারকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছে। গাজা এবং পশ্চিম তীরের অবশিষ্ট এলাকাগুলোও দখল করে নেয়া হচ্ছে। তাদের উপর আকাশ, ভূমি, স্থল সর্বত্র নজরদারী করা হচ্ছে, বোমা মেরে সবকিছু ধ্বংস করা হচ্ছে, তাদের প্রতিটি নড়াচড়া পর্যন্ত মনিটরিং করা হচ্ছে, তাদেরকে পেটে-ভাতে মারার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা সকাল-বিকাল টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাচ্ছি কিভাবে

ঘরবাড়ি গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে কিভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হচ্ছে। বিশ্ববাসী এই দৃশ্য চোখ বুজে দেখে যাচ্ছে। নিরাপত্তা পরিষদের সামান্যতম টনক নড়ছে না। আরবরা কবরে শায়িতদের মত নিশ্চুপ হয়ে আছে- আর এতকিছুর পরও অত্রাঞ্চলের শাসকরা আমেরিকার সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে- অথচ সবকিছুর পেছনে আমেরিকার অন্ধ সমর্থন অব্যাহত রয়েছে, সামরিক-অর্থনৈতিক-প্রযুক্তিগত দিকসহ সব ব্যাপারে ইসরাইলের প্রতি। এছাড়াও আরো জুলুম-অত্যাচার ও নিপীড়ন দেখুন আফগানিস্তান ও ইরাকে।

চরমপন্থার আরেকটি কারণ হল- আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে শাসকরা চরম জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ পরিহার করে তাঁর বিধানের প্রতি কোন রকমের তোয়াক্কা না করে, আদল-ইনসাফের প্রতি কোন রকমের ভ্রুক্ষেপ না করে, জনগণের আশা-আকাংখার প্রতি, তাদের সম্মানজনক রুটি-রুজি ও জীবনোপকরণের দিকে সামান্যতম নজর না দিয়ে স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে যাচ্ছে।

এসবই চরমপন্থার কারণ নিঃসন্দেহে কিন্তু এসবই আসল কারণ নয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণও নয় যেমনটি কতিপয় গবেষক মনে করেন।

যারাই এসব ইসলামী দল বা গ্রুপগুলোর উপর গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখবে তারাই দেখতে পাবেন যে, এর পেছনে রয়েছে চিন্তাগত কারণ- এটিই সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারকারী।.এটির প্রভাবেই এসব যুবকরা তাদের পূর্বসূরী খাওয়ারিজদের পথ ধরেছে, যাদের ব্যাপক পরিচিতি ছিল তাহাজ্জুদগুজার, (নফল) রোজাদার এবং কুরআনের কারী হিসেবে। এতদসত্ত্বেও তারা অন্যান্য মুসলমানদের রক্তকে বৈধ করে নিয়েছিল- তাদের চিন্তা ও বুঝ-সমঝের জগতে ভুল ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ করেছিল তাদের অন্তঃকরণ ও নিয়তে নয়।

তাদের চিন্তার জগতে দীন সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে ও তাদের জীবন

সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মলাভ করে, যা জেল, নির্যাতন বা কঠোর শাস্তি দিয়ে দূর করা সম্ভব নয় বরং এতে তাদের বক্রচিন্তার ক্ষেত্রে বক্রতা- কট্টরতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

হাঁ, এখানে নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপই যথেষ্ট নয় বরং তাদেরকে চিন্তা-চেতনার দিক দিয়েও প্রতিরোধ করতে হবে। তাদের সাথে বিশিষ্ট আলেম-ওলামাদের আলাপ-আলোচনার পদক্ষেপ নিতে হবে, তাদের ভ্রান্ত চিন্তার পরিবর্তন সাধন করতে হবে। তাদেরকে দলিল-প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনতে হবে। তাদের সঙ্গে হক্কানী আলেম-উলামাদের বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে যারা সরকারী আলেম হিসেবে বা সরকারের দালাল হিসেবে চিহ্নিত নয়।

হযরত আলী (রা.) খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে আলোচনার জন্য মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানতাপস বিশিষ্ট কুরআন গবেষক-ভাষ্যকার (حبر الأمة وترجمان القرآن) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের সাথে আলোচনা করেন, তাদেরকে দলিল-প্রমাণ দিয়ে, যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝান যার ফলে কয়েক হাজার ফিরে আসে আর কিছু লোক তাদের বাতিল চিন্তাধারার উপর অটল থাকে।

আমাদেরকে এই সব দল ও গ্রুপের সাথে অবশ্যই এ কাজ করতে হবে যারা মিসরে, আলজিরিয়ায়, সৌদি আরবে, মরক্কো ইত্যাদি দেশে ইতোমধ্যে অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছে। তাদের সাথে যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই সবর করতে হবে, তাদের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। এরপর যারা সঠিক পথে ফিরে আসবে তারা আসলো আর যাবা আসবে না তারাও অন্তত সঠিক দলিল-প্রমাণ জেনে গেল।

চরমপন্থী দলগুলোর চিন্তাচেতনার পর্যালোচনা

আমাদেরকে অবশ্য জানতে হবে সেসব জামায়াত বা দল সম্পর্কে যারা নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে। তারা মূলতঃ এক বিশেষ দর্শনের কারণে এটি করছে, তারা ইসলামের বিধি-বিধানকে ও এর প্রমাণাদিকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছে।

যারা আমাদের বর্তমান আরববিশ্বের চরমপন্থী দলগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয় (যেমন আল-কায়েদা, আল-জামাআ আল-ইসলামিয়া, আসসালাফিয়া আল-জিহাদিয়া, জামাআতে আনসারুল ইসলাম) তাহলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন দেখতে পাবে এবং তাদের ইসলামী বিশ্লেষণ লক্ষ্য করলে দেখবে যে তারা কুরআন-হাদীস এবং বিভিন্ন মনীষীদের উক্তি দিয়ে তাদের পক্ষে কিভাবে দলিল পেশ করে থাকে। আমরা এদের এই বুঝের বিষয়টি অবশ্যই পর্যালোচনা করবো এবং এর জবাব দেব।[১]

একথা ঠিক যে এরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মুতাশাবিহাত (সংশয়যুক্ত) দলিলাদির উপর নির্ভর করে এবং মুহকামাত (সুস্পষ্ট দলিলাদি) পরিত্যাগ করে, তারা ছোটখাট বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বড় বড় বিষয়াবলিকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তারা বাহ্যিক দিকটাকে আঁকড়ে ধরে, এর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য (مقاصد) সম্পর্কে গাফেল থাকে, তেমনিভাবে গাফেল থাকে এসব দলিলাদির বাহ্যিক দিকটিকে কোন কোন দলিল-প্রমাণ বিপক্ষে রয়েছে। এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দলিল-প্রমাণকে তার সঠিকস্থানে ব্যবহার বা প্রয়োগ করেনি। একে তার সঠিকস্থান থেকে অন্যঅর্থে ব্যবহার করেছে। কিন্তু -অবস্থা যাই হোক না কেন- তাদের এমন বুঝ হয়েছে যা দ্বারা তারা চরমপন্থাকে গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের ঐতিহ্যের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ততা দেখিয়ে কিছু কিছু যুবককে এবং যাদের ইসলাম সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞান রয়েছে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা

---

১. এ বিষয়টি নিয়ে আমরা লেখা "আসসাহওয়া আল-ইসলামিয়া মিনাল মুরাহাকা ইলাররুশদ" গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি এবং আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো 'ফিকহুল জিহাদ' নামক গ্রন্থে যা এখন গ্রন্থাবদ্ধ করা হচ্ছে।

কোন কিছুর গভীরে যেতে পারেনি। তাদের বুঝের বা জ্ঞানের মূলে হল পূর্বের খাওয়ারিজদের চিন্তা-চেতনা। যারা কুরআন পাঠ করত কিন্তু তাদের কুরআন গণ্ডদেশের নিচে নামেনি। অর্থাৎ তারা কুরআনের শিক্ষা ও দর্শন বুঝেনি।

নিজ দেশের অভ্যন্তরে চরমপন্থার প্রয়োগ

এসব দল বা গ্রুপগুলো প্রথমে নিজেদের দেশের মধ্যে চরমপন্থা প্রয়োগ করে। তারা দেশের সরকারের আইনের বিরুদ্ধে, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে লেগে পড়ে।

তারা কিসের ভিত্তিতে এটা করল এবং এর পেছনে শরীয়তের কোন কোন দলিলাদিকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করল?

বর্তমান সরকার ব্যবস্থাকে কুফরী সরকার ব্যবস্থা মনে করা

এসব চরমপন্থী দলগুলো মনে করে যে বর্তমান সরকারগুলো ইসলামী সরকার নয় বরং তাদের স্পষ্ট বক্তব্য হল- এরা কাফের সরকার। কেননা এরা আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করে না, দেশ পরিচালনা করে না। তারা দেশ চালাচ্ছে মানব রচিত আইন দ্বারা, আর এজন্য তারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে দীন-ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে যেন তারা ক্ষমতা ত্যাগ করে। কারণ তারা সুস্পষ্ট কুফরী করেছে, এ ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান।

তাদের এই দর্শনকে আরো শক্তিশালী করছে এই কারণে যে এসব সরকার আল্লাহর দুশমন কাফেরদের সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে যারা সদাসর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা আল্লাহর নেক বান্দা ও দায়ীদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত, যে সব লোকেরা আল্লাহর আইন চালু করার দাবী জানাচ্ছে তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ - (المائدة : ٥١)

"আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের (কাফেরদের) সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।" (সূরা মায়েদা ঃ ৫১)

এসব দলগুলোর আরো দলিল হল- এসব সরকারগুলো মসজিদুল আকসার প্রতিরোধে চরম ব্যর্থতা দেখিয়েছে যে মসজিদ হল ইসরা ও মিরাজের ভূমি। এসব সরকারের অনেকেই যায়নবাদী ইসরাইলী সরকারের হাতে হাত মিলিয়েছে আর কেউ কেউ তাকে স্বীকৃতিও দিয়েছে, আর কেউ কেউ ইসরাইলের দোসর ও পৃষ্ঠপোষক আমেরিকাকে ঘাড়ে চড়িয়েছে এবং তার হাতে লাগাম ছেড়ে দিয়েছে সে যা ইচ্ছা করে তাই করছে, সে তাদের চিন্তাচেতনা ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টাই করছে না; বরং তার ইসলামী পরিচয় পরিবর্তন করে দিতে চায় এবং তাদের ঐতিহাসিক পরিচিতিতে মুছে ফেলতে চাইছে।

বর্তমান সরকারগুলো নিজেদের অবস্থানের ব্যাপারে এসব অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য বিভিন্ন কথা বলছেঃ তারা ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করেছে। তারা মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছে, আলেম-উলামাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খতীব, মুয়াজ্জিন নিয়োগ দান করছে, দীনি শিক্ষা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করছে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু করেছে, মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন পরিশোধ করছে, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা পালন করছে, রেডিও-টেলিভিশনে কুরআন সম্প্রচার করছে ইত্যাদি ইত্যাদি ধর্মীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন করছে যা কোন না কোন ভাবে প্রমাণ করে যে তারা মুসলিম সরকার যার সারকথা হল-তারা ইসলামকে আকীদা হিসেবে স্বীকার করে শরীয়ত হিসেবে নয়, ইবাদত হিসেবে মুয়ামালাত হিসেবে নয় অথবা তারা কুরআনের কিছু মানছে আর কিছু অংশকে মানছে না।

আবার কোন কোন দেশের সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে যে , ইসলামী শরীয়তই একমাত্র সকল কিছুর উৎস বা মূল ভিত্তি। আবার কেউ অজুহাত পেশ করে যে, পশ্চিমা পরাশক্তির চাপের কারণে ইসলামী বিধি-বিধান চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। আর কেউ কেউ বলে, ইসলামী শরীয়ত একসাথে চালু করা সম্ভব নয়, এর জন্য ধাপে ধাপে বা ক্রমান্বয়ে এগুতে হবে!

তাদের কেউ কেউ বলে- আমরা আমেরিকাকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করিনি কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলি। কেননা আমরা দুর্বল তাদের মোকাবিলা করতে অক্ষম। আমরা মহান আল্লাহর এই বাণীর উপর আমল করছিঃ

الاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَةً - (اَل عمران : ٢٨)

"তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশংকা থাকে।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২৮) [অর্থাৎ আশংকার কারণেই বন্ধুত্ব রক্ষা করা হচ্ছে]

আবার কেউ বলে..... কেউ...... বিভিন্ন অজুহাত পেশ করছে নিজেদের অবস্থানের ব্যাপারে যার কোনটিই অকাট্য নয়, তবে এর দ্বারা তাদের সুস্পষ্ট কুফরীর অভিযোগ তিরোহিত হয়ে যায়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ফতওয়া

চরমপন্থী দলগুলো তাদের যুক্তির পক্ষে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ফতওয়াকে পেশ করে যেভাবে তিনি কিতাল (সশস্ত্র লড়াই করতে) অভিমত দিয়েছেন প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যারা ইসলামের সুস্পষ্ট বিধি-বিধান পালনে অস্বীকার করবে যে সব বিধি-বিধান অকাট্যভাবে প্রমাণিত। যেমন নামায, যাকাত কিংবা আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা না করা, রক্তপাত, ধনসম্পদ, ইজ্জত-আব্রু কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান ইত্যাদিতে। জিহাদী দলগুলো এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নির্ভর করেছে আল-ফারিদ্বা আল-গায়েবা [الفريضة الغائبة] (অনুপস্থিত বা হারানো ফরজ) নামক গ্রন্থের উপর। তারা তাদের দলগঠনে এই ফতওয়াকে মূল দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এর আলোকেই তারা তাদের সব কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করছে।

তারা এখানে হযরত আবু বকর (রা.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এটা যদি যাকাত অস্বীকারকারীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে যারা শরীয়তের বিধান কায়েম করে না তাদের ব্যাপারে কি করতে হবে? ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা সমস্ত জনগণের প্রাণের দাবী অথচ তারা এদের প্রতিই সবচেয়ে খড়গহস্ত, এদের প্রতিই সবচেয়ে বেশী জুলুম

চালাচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী শত্রুতা পোষণ করছে।

এরা ভুলেই গেছে যে, এসব অস্বীকারকারী যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়েছে তারা ছিল ওলীউল আমর বা নেতৃস্থানীয় লোক, যেমনটি লড়েছেন হযরত আবু বকর (রা.), তারা সাধারণ মানুষ নয়, নচেৎ এক ভয়াবহ বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টি হত।

জাতির উপর জোর করে চেপে বসা সরকার সমূহ

চরমপন্থী দলগুলো আরেকটি বিষয়কে জোর দিয়ে বলে তা হল- এসব সরকারগুলোর বৈধতা নেই। কেননা এদেরকে শরীয়ত পন্থায় জনসাধারণ চয়ন বা নির্বাচন করেনি কিংবা আহ্লুল হল্লে ওয়ালআকদ বা ইসলামী জ্ঞানী-গুণী গবেষকগণ তাদের চয়ন করেনি এবং সাধারণ মানুষ তাদের বাইয়াত করেনি। এরা জনগণের সমর্থন বা সন্তুষ্টি লাভ করেনি যা শরিয়তের মূল বিবেচ্য। বরং তারা ক্ষমতায় গেছে বন্দুক, তরবারি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে। যা বন্দুকের বা তরবারির সাহায্যে এসেছে তাকে বন্দুক-তরবারি দিয়েই প্রতিরোধ করতে হবে। তাকে কলম যুদ্ধে পরাজিত করা যাবে না!

এরা ভুলে গেছে আমাদের ফকিহ্গণ অনেক পূর্বেই যা বলে গেছেনঃ জোরজবরদস্তি ক্ষমতায় পৌঁছার পন্থাসমূহের মধ্যে একটি পন্থায় যদি অবস্থা স্থিতিশীল হয়ে যায় এবং জনগণ তাকে মেনে নেয়।

এটিই করেছেন আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান ইবনে জুবাইর (রা.)-এর উপর বিজয় লাভের পর, জনগণ এটিকে মেনে নিয়েছে, এদের মধ্যে ছিলেন কতিপয় সাহাবী যেমন ইবনে উমর ও আনাস (রা.), রক্তপাত এড়ানো এবং ফিতনা দূর করার জন্য। প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে– জালেম শাসক অব্যাহত ফিতনা থেকে উত্তম।

এই হল ইসলামী বিধানের (ফিকহ্র) বাস্তবতা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি এবং গুরুত্ব দেয়া, রক্তপাত এড়ানোর এবং ফিতনার পথ বন্ধ করা, যে ফিতনার পথ একবার খুলে দিলে সহসা তা বন্ধ হয় না। এর

দ্বারা দুটি অকল্যাণের মধ্যে অল্প অকল্যাণ গ্রহণ করা এবং কম ক্ষতিকারককে গ্রহণ করা অধিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্যে, ফিকহুল মুয়াজানা বা তুলনামূলক বিধি-বিধানের প্রতি আমল করা।

সরকারগুলো মন্দ কাজ এবং আল্লাহ্ নিষিদ্ধ কাজকে বৈধতা দিচ্ছে

এসব চরমপন্থী দলগুলো মনে করে যে, এসব প্রকাশ্য গর্হিত কাজকর্ম যা এসব সরকার বৈধতা দিচ্ছে- মদ পান, জুয়া, ব্যভিচার, বেহায়াপনা, সুদ ও সবধরনের হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় যার শক্তি রয়েছে তার উপর ওয়াজিব হল তা শক্তির দ্বারা প্রতিহত ও প্রতিরোধ করা। আর তারা মনে করে যে, তাদের সে শক্তি রয়েছে। এ জন্য তাদের উপর থেকে হাত দ্বারা প্রতিরোধ করার বিধান সাকেত হয়ে (নেমে গিয়ে) মুখের জবান দিয়ে পরিবর্তন করার বিধান প্রযোজ্য হবে না। যেমনটি রাসূল (সা.) এক প্রসিদ্ধ হাদীসে বলেছেনঃ

مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ -

"তোমাদের কেউ অন্যায় হতে দেখলে হাত দিয়ে তা প্রতিহত করবে। যদি হাত দিয়ে প্রতিহত করতে না পারে তাহলে মুখের জবান দিয়ে তা পরিবর্তন করবে।"[১]

অন্যায়কে প্রতিহত ও পরিবর্তন করার জন্য যেসব শর্তাবলী ও বিধি-বিধান আলেম-উলামা উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে এরা সম্পূর্ণ গাফেল। আমরা এ ব্যাপারে কতিপয় গ্রন্থে আলোচনা করেছি।[২]

এসব দলের কোন কোনটি আবার পুরো সমাজকেই মনে করে যে, এ সমাজ যেহেতু এই সরকার ও তার বিধি-বিধানকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে, এদের ব্যাপারে চুপ রয়েছে, এদেরকে কাফের মনে করে না, তারা

১. মুসলিম ঈমান অধ্যায়, হাদীস নং ৪৯, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত।

২. দেখুন লেখকের লিখা ফতওয়া মুয়াসেরা [বর্তমান ফতওয়া], খ. ২, পৃ. ৬৮১-৬৯১, সংস্করণ- আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত।

নিজেদের কথিত কায়েদা (সূত্র) মতে ফয়সালা দেয়ঃ যে কাফেরকে কাফের বলে ঘোষণা করে না, সেই কাফের!

এভাবেই তারা মানুষকে কাফের সাব্যস্ত করতে বাড়াবাড়ি করছে এবং সমস্ত মানুষকেই কাফের বলে সাব্যস্ত করছে।

এর উপর ভিত্তি করেই তারা কোন ভ্রুক্ষেপই করে না যে, কোন বেসামরিক লোককে হত্যা করল বা যাকে হত্যা করল তার সাথে সরকারের কোন সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক। কেননা তারা সবাইকে কাফের মনে করে এজন্য তাদের দৃষ্টিতে সবার রক্ত ও সম্পদ বৈধ।

এমনিভাবে তারা সংখ্যালঘু অমুসলিমদের ব্যাপারে মনে করে যে, তারা চুক্তিভঙ্গ করেছে জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) না দিয়ে এবং এই সব মুরতাদ সরকারকে সমর্থন করে, তাদের মানব রচিত আইনকে মান্য করে, আর ইসলামী শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে। আর এ কারণেই তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের নিকট কোন জিম্মাদারী ও আমানতদারী নেই। তাদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ। আর এজন্যই তারা স্বর্ণের দোকান লুটপাট করে- মিসরে কিবতীদের এবং কিছু কিছু মুসলমানের মালামাল ও সম্পদ লুট করে নেয়।

তাদের দৃষ্টিতে পর্যটকরাও ওদের মতই যারা মুসলিম দেশগুলোতে বৈধ ভিসা নিয়ে আগমন করছে, যাদেরকে ফকিহগণ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত (مستأمنين) বলে গণ্য করে থাকেন যদিও তাদের দেশ মুসলিম দেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। তারা এদের রক্তকে বৈধ মনে করে, কেননা এরা অবৈধ সরকারের নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছে আর তাদের দেশও যুদ্ধরত রাষ্ট্র, সুতরাং তাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে কোন চুক্তি-অঙ্গিকার নেই। মুসলমানদের প্রতি ওয়াজিব হলঃ এদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এদেরকে হত্যা করতে হবে। এদের জানমালের কোন নিরাপত্তা নেই।

এরা পশ্চিমা দেশগুলো সম্পর্কে বলে থাকে, এদের কেউ কেউ এসব দেশে বসবাসও করছে, তাদেরকে সেসব দেশ নিরাপত্তা প্রদান করেছে বা রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে যারা তাদের নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এসব দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদেরকে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও সেসব দেশগুলো করেছে এবং তাদেরকে ভয় থেকে নিরাপদ করেছে।

এরা জোর দিয়ে নিঃসংকোচে বলে- এসব দেশ সবগুলোই কাফের রাষ্ট্র, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে যুদ্ধরত। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের উপর ওয়াজিব যেন শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিযিয়া প্রদানে বাধ্য হয়। তাদের কাউকে এসব দেশে বসবাস করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা বলে- এটি বাথরুমের মত, প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহার করছি যদিও এখানে ময়লা-আবর্জনা রয়েছে।

এরা সবাই কাফের- এদের রক্ত বৈধ, এদের ধন-সম্পদও মুসলমানদের জন্য বৈধ দীনের দলিলাদির ভিত্তিতেই।

তারা এ ব্যাপারে কুরআনের কতিপয় আয়াত ও হাদীসে রাসূল উপস্থাপন করে যা তারা সঠিকস্থানে প্রয়োগ করে না। যদি তাদেরকে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিল-প্রমাণ দিয়ে পাকড়াও করা হয় তাহলে তারা বলে- এসব তরবারির আয়াত (লড়াই করার বিধান) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, আল-কায়েদার প্রধান উসামা বিন লাদেন তাদের অবস্থান সম্পর্কে সর্বশেষ ২০০৪ সালের এপ্রিলে যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে বলেছে-ইউরোপিয়ানরা যেন আমেরিকার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলমানদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদেরকে তাদের দেশে বা তাদের দূতাবাসগুলোতে কিংবা তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন কিছুতে তাদের দেশে বা বাহিরে কোথাও আক্রমণ করা হবে না।

এটি আল-কায়েদা নেতার নতুন বুঝ বা অবস্থান বলে মনে হয়েছে, তারা ইতোপূর্বে সকল ইহুদী-খৃষ্টানকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল যতক্ষণ না তারা জিযিয়া প্রদান করে। এই অবস্থান থেকে বুঝা যায় তারা মুসলমানদের ব্যাপারে হাত গুটালে এবং আমেরিকাকে সাহায্য না করলে তাদের প্রতি হামলা করা হবে না।

সংক্ষেপে এই হল চরমপন্থী দল বা গ্রুপগুলোর দীন সম্পর্কে সমঝ বা জ্ঞান, যার উপর ভিত্তি করে তারা যতসব অঘটন ঘটিয়েছে যা দেখে শিশুরা হতবিহ্বল হয়েছে, যা দেখে শরীর শিহরিত হয়েছে, মন ক্ষতবিক্ষত

হয়েছে। তারা তাদের নিজের দেশের লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তারা মুসলমান হোক বা অমুসলিম, বিদেশী হোক বা পর্যটক যেই হোক না কেন।

নিঃসন্দেহে তাদের এই বুঝ বা সমঝ সম্পূর্ণ ভুল ও বিভ্রান্তিকর যার প্রতিটি দিকেই রয়েছে বিভ্রান্তি ও ত্রুটি। তাদের ব্যাপারে সমস্ত আলেম-উলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে জ্ঞানগত দিক দিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। তাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে হবে। তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে শরীয়তের দলিল-আদিল্লার আলোকে তুলে ধরতে হবে কুরআন-হাদীস ও মুসলিম উম্মার ইজমা বা ঐকমত্যের প্রমাণাদি দিয়ে।

চরমপন্থী দলগুলোর চিন্তার বিভ্রান্তি

জিহাদ ও অমুসলিমদের ব্যাপারে তাদের চিন্তাধারা ও বুঝ-সমঝে বিরাট ত্রুটি রয়েছে, তাদের ধারণা সকল কাফেরের সাথে লড়াই করা ওয়াজিব যদিও তারা শান্তিকামী হয়ে থাকে। আমরা এ বিষয়টি আমাদের লিখা ফিকহুল জিহাদ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১]

নিরাপত্তা প্রাপ্ত (আহলুজজিম্মা) খৃষ্টান, কিবতী ও অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি, তাদের অধিকার ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার বিষয়টি বুঝার ক্ষেত্রে তাদের বিরাট ভ্রান্তি ও ত্রুটি রয়েছে।

অন্যায়ের প্রতিকার ও প্রতিরোধ শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, সে সম্পর্কে শর্তাবলী বুঝার ক্ষেত্রে তাদের বিরাট ভ্রান্তি ও ত্রুটি রয়েছে।

সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার ব্যাপারটি বুঝার ক্ষেত্রে এবং এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের যে সব নির্দেশাবলী ও দিকনির্দেশনা রয়েছে তা বুঝার ক্ষেত্রে তাদের বিরাট ভ্রান্তি ও ত্রুটি রয়েছে। যে কেউ চাইবে আর অস্ত্র হাতে তুলে নিবে এরকম কোন পথ ইসলামে খুলে রাখা হয়নি।

আমরা শরীয়তের আলোকে এসব আলোচনা করব।

---

১. বইটি যন্ত্রস্থ অবস্থায় রয়েছে। মহান প্রভুর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন বইটি অতি দ্রুত পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার তাওফীক দেন।

চিন্তার বিভ্রান্তিই চরমপন্থীদের প্রধান সমস্যা

এটি সুস্পষ্ট যে, এদের অধিকাংশের মুসিবত হল- তাদের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সংকট; তাদের অন্তঃকরণে নয়। এদের অধিকাংশই একনিষ্ঠ-মুখলেস, তাদের নিয়ত ভাল, তারা তাদের রবের ইবাদতকারী। এদের অবস্থা তাদের পূর্বসূরী খাওয়ারিজদের মত যারা সমস্ত মুসলমানকে কাফের বলে গণ্য করে, তারা আমিরুল মুমিনীন আলী (রা.)-কে কাফের সাব্যস্ত করে তার রক্তকে বৈধ করে নেয় এবং এর সাথে সাথে মুসলমানদের রক্তকেও বৈধ বলে ঘোষণা করে। সহীহ হাদীসে দশ দিক দিয়ে তাদের নিন্দার কথা বর্ণিত হয়েছে যেমনটি ইমাম আহমাদ বলেছেন।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছেঃ

يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ إِلَى صَلاَتِهِمْ وَقِيَامَهُ إِلَى قِيَامِهِمْ وَقِرَاءَتَهُ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ -

"তোমাদের কেউ তাদের নামায দেখে, রাতের তাহাজ্জুদ দেখে, কুরআন তেলাওয়াত দেখে, নিজেদের নামায, তাহাজ্জুদ ও কুরআন তেলাওয়াতকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তাদের পাঠ গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর তার ধনুক থেকে বের হয়ে যায়।"[১]

তারা (নফল) রোযাদার, তাহাজ্জুদগুজার, কুরআন পাঠকারী, বেশী বেশী ইবাদতকারী, কিন্তু তাদের কুরআন পাঠ কণ্ঠনালীর নিচে নামে না। অর্থাৎ তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না, তাদের আকলে (জ্ঞান-বুদ্ধিতে) ধরে না, এর মর্মার্থ বুঝে না, এর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় না। তারা শুধু এর শাব্দিক ও প্রকাশ্য অর্থই বুঝে থাকে।

---

১. বুখারী হাদীস নং ৩৬১০, মুসলিম হাদীস নং ১০৬৪, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত।

তাদের এই বক্র বুঝ ও সমঝ অন্যান্য মুসলমানদের ধনসম্পদ লুন্ঠন করা এবং রক্ত প্রবাহিত করাকে বৈধ করে দিয়েছে, এমনকি তারা ইসলামের বীরমুজাহিদ হযরত আলী (রা.)-এর রক্তকেও বৈধ করে নেয়। তাদের এক কবি আলীর হত্যাকারীর প্রশংসা করে বলেঃ

বাহ্ কি চমৎকার! মুত্তাকী হতে সেই আঘাত, যার
উদ্দেশ্য হল মহান আরশের মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন।
আমি তাকে একদিন স্মরণ করলাম, বুঝলাম
হাশরের মিজানে তার জন্য রয়েছে অফুরন্ত সওয়াব।

ভাল নিয়ত মন্দ কাজকে উত্তম বানায়না

নবী করীম (সা.) সতর্ক করে দিয়েছেন সবধরনের নিয়ন্ত্রণহীন, উদ্দেশ্যহীন কাজকর্ম করা থেকে এবং আবেগপ্রবণ হয়ে অঘটন ঘটানোর ব্যাপারে যা কখনো কখনো ভাল মানুষও সৎ নিয়তে ও মহৎ উদ্দেশ্যে করে থাকে, এর পরিণাম-পরিণতি কি হবে সেদিকে খেয়াল না করেই। এটি তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই হয়ে থাকে। যদি সমাজ এ ব্যাপারে সচেতন না হয়, তাদেরকে এসব থেকে নিবৃত্ত না করে, তাদের এসব কর্মকাণ্ডে বাধা না দেয় তাহলে তারা পুরো সমাজকেই এর দ্বারা কলুষিত করে ফেলবে, তাদের নিয়ন্ত্রণহীন কর্মকাণ্ড তাদের সৎ-নিয়ত থাকা সত্ত্বেও পুরো সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।

এজন্যই রাসূল (সা.) সমাজের বুদ্ধিমান-বিবেকবান ও আলেম-উলামাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যেন তাদের বাধা দেয় যেন তারা এসব চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে না পারে। এটা করতে হবে গোটা সমাজকে বাঁচানোর স্বার্থে, তাদের জীবন-মালের হেফাজতের স্বার্থেই।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এ জন্য এক সুন্দর প্রাণবন্ত উদাহরণ পেশ করেছেন তাহল- দুই বা ততোধিক তল বিশিষ্ট জাহাজের আরোহীদের সাথে যার কিছু রয়েছে নিচ তলায় আর কিছু রয়েছে উপরের তলায়। যদি নিচতলার

যাত্রীরা তাদের অংশে ফুটা করে সরাসরি সমুদ্র বা নদী থেকে পানি পাওয়ার জন্য এই দাবী করে যে, তারা তাদের অংশে যা কিছু করার ব্যাপারে স্বাধীন, তারা উপরে যারা আছে তাদেরকে বার বার গিয়ে বিরক্ত করতে চায় না।

আসুন আমরা নবীর হাদীসটি সরাসরি পাঠ করি–

عن النعمان بن بشير رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.

"নুমান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেনঃ "আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও তা লঙ্ঘনকারীর উপমা হল- কয়েকজন লোক লটারীর মাধ্যমে একটি নৌযান ভাগ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পায় উপর তলায় এবং কেউ নীচের তলায়। তাদের মধ্যে যারা নীচের তলায় ছিল, তারা যখন পানি পিপাসা অনুভব করত, তখন যারা তাদের উপর ছিল, তাদের নিকট যেত, (এতে উপরের লোকদের কষ্ট হত)। এমতাবস্থায় নীচের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, যদি আমরা নিজেদের অংশে ছিদ্র করে পানি নিতাম আর উপরের লোকদেরও কোন কষ্ট না দিতাম, তবে ভাল হত। নবী করীম (সা.) বলেন, এখন যদি উপরের লোকেরা নীচের লোকদের মর্জির উপরে ছেড়ে

দেয়, তবে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তাদেরকে বাধা দেয়, তবে তারা নিজেরাও বাঁচবে অন্য সকলেও বেঁচে যাবে।"[১]

এই হাদীসে মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত সংহতি ও দায়-দায়িত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা যেন তাদের কোন সন্তানকে তাদের অজ্ঞতার মধ্যে না ছেড়ে দেয় এবং তাদের মন্দ আচরণ করার সুযোগ না দেয় যদিও তারা নিষ্ঠাবান (মুখলেস) হয়ে থাকে। কারণ, শুধুমাত্র নিষ্ঠা বা এখলাসই যথেষ্ট নয়। অবশ্যই এখলাসের সাথে সাথে কাজটিও সঠিক হতে হবে।

চরমপন্থী দলগুলোকে ইসলাহ্ করার পন্থা

আলেম-উলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদেরকে অবশ্যই চরমপন্থী দল বা গ্রুপগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। তাদের ইসলাহ করতে হবে উত্তম পন্থায় যেমনটি মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন। তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে, না হলে কমপক্ষে তাদের নেতাদের সাথে যুক্তি-তর্ক ও দলিল-প্রমাণ দিয়ে আলাপ-আলোচনা, পর্যালোচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রাখেতে হবেঃ

এক. তারা যে বর্তমানে চরমপন্থা প্রয়োগ করছে এবং জনগণ যা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে, এটির কোন শরয়ী ভিত্তিই নেই- না এর দলিল-প্রমাণের দিক থেকে আর না এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের (مقاصده الكلية) দিক থেকে।

দুই. এই চরমপন্থার কার্যকারিতা কতটুকু, যদি আমরা এটিকে বৈধ মনে করি– এটি কি খারাপ অবস্থাকে পরিবর্তন করে দিবে? বা ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে? অথবা মুসলিম উম্মাহর কোন বিরাট উদ্দেশ্য সাধন করে দিবে?

জিহাদী দলগুলো যেমন জামাআতুত-তাকফীর, জামাআ ইসলামিয়া, সালাফিয়াতুল জিহাদ এবং সর্বশেষে আল-কায়েদা ঘোষণা করেছে যে

---

১. বুখারী হাদীস নং ২৪৯৩

বর্তমান সরকারগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তারা এজন্য সশস্ত্র সংঘর্ষের পথ গ্রহণ করেছে। তারা বক্তৃতা-বিবৃতি অথবা শান্তিপূর্ণ পন্থায় পরিবর্তন না করে যেমন বিভিন্ন সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, মসজিদ-মাদরাসায় আলোচনা, সভা-সমাবেশ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ ইত্যাদি না করে ইসলাম বিরোধী সরকারকে প্রতিরোধ করার এবং জনগণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করার আহ্বান জানায়।

আর যেহেতু এসব দল বা গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত সরকারের মত সামরিক শক্তির অধিকারী নয় যা দ্বারা শক্তির মুকাবিলা করে এজন্য তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেয়।

এরমধ্যে হলঃ গুপ্তহত্যা এবং সরকারী স্থাপনায় নাশকতামূলক আক্রমণ।

এই দুটি পন্থায় সাধারণতঃ নিরপরাধ বেসামরিক লোকজন আক্রান্ত হয় যাদের এব্যাপারে কোন ভূমিকাই নেই। এরমধ্যে রয়েছে শিশু, বৃদ্ধ, নারী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যাকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালানো হয় সেই বেঁচে যায় অথচ যাদের হত্যার উদ্দেশ্য ছিল না এমন অনেক বেসামরিক লোকজন নিহত হয়।

ইসলামে একথা সুবিদিত যে, মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে যুদ্ধের সময় যুদ্ধের সাথে যারা জড়িত থাকবে না তাদেরকে হত্যা করা জায়েয নয়। তাহলে কিভাবে মুসলমানদেরকে হত্যা করা যাবে? হাদীস শরীফে এসেছেঃ

لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.

"আল্লাহর নিকট এই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া অনেক সহজ একজন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চেয়ে।"[১]

---

১. নাসাঈ, তাহরীমুদদিমা অধ্যায়, ৮৭/৮২, ৮৩ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত; তিরমিযী, দিয়াত অধ্যায়, হাদীস নং ১৩৯৫; ইবনে মাজা হাদীস নং ২৬১৯, বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত। ইমাম বুসায়রী তাঁর যাওআয়েদ গ্রন্থে বলেন এর সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর তালখীস গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন এবং ইমাম আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

একথাও সুবিদিত যে, ইসলাম রক্তপাতের ব্যাপারে প্রচণ্ড কড়াকড়ি আরোপ করেছে এমনকি কুরআন অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের সাথে একথা সাব্যস্ত করেছে যে,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا - (المائدة : ٣٢)

"যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল।" (সূরা মায়েদা ঃ ৩২)

ইসলামের নবী বলেনঃ "একজন মুমিন তার দীনের সহজতার মধ্যে ততক্ষণ থাকল, যতক্ষণ না সে অবৈধভাবে কোন রক্তপাত ঘটাবে।" (বুখারী ইবনে উমর (রা.) থেকে)

আর সরকারী স্থাপনা ধ্বংস করা প্রকৃতপক্ষে জনগণের সম্পদই ধ্বংস করা।

তাদের আরেকটি পন্থা হলঃ পর্যটকদের হত্যা করা। যারা হল ফিকহের ভাষায় 'নিরাপত্তাপ্রাপ্ত' রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে তাদেরকে ভিসা প্রদানের মাধ্যমে। সুতরাং সবার প্রতি ওয়াজিব হল এই যে- তাদের নিরাপত্তার মর্যাদা দেয়া, তাদের প্রতি অন্যায় করা যাবে না, তাদের জিম্মাদারীর ব্যবস্থা করতে হবে যদিও তাকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে কোন মুসলমান দাস। হাদীস শরীফে এসেছে- "মুসলমানদের জিম্মাদারী প্রদান হতে পারে তাদের অধস্তন লোক থেকেও।" [১]

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেনঃ "মুসলমানদের জিম্মাদারী একই। সুতরাং যদি কেউ কোন মুসলমানদের অসম্মান-অমর্যাদা করে তাহলে তার উপর আল্লাহ, ফেরেস্তা এবং সমস্ত মানুষের অভিসম্পাত।" [২]

---

১. আবু দাউদ, ইবনে মাজা ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানী জামেউস সাগীরে এটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন (৬৭১২)।

২. আলী (রা.) থেকে বুখারী হাদীস নং ১৭৭১; মুসলিম হাদীস নং ১৩৭১

রাসূল (সা.) উম্মে হানীকে বলেন, যিনি তাঁর এক অমুসলিম নিকটাত্মীয়কে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন- হে উম্মে হানী! আপনি যাকে আশ্রয় দিয়েছেন আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম।"[১]

এ বিষয়টির উপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ফিকহুল জিহাদ' নামক গ্রন্থে।

চরমপন্থা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয় কি?

চরমপন্থার ব্যাপারে যারা গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করেন তাদের নিকট এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, চরমপন্থামূলক কর্মকাণ্ড এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ দ্বারা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটানো যায় না, এমনকি তাকে দুর্বলও করা সম্ভব হয় না। কখনো কখনো চরমপন্থীরা সফল হয়ঃ রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী অথবা কোন মন্ত্রী বা কোন পদস্থ কর্মকর্তা বা এধরনের কাউকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু এর দ্বারা সমস্যার সমাধান করা যায় না। বরং দেখা যায় যে নতুন এলো সে পূর্বের চেয়ে আরো বেশী কঠোর ও রূঢ় ইসলামপন্থীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে। এজন্য এক কবি আক্ষেপ করে বলেনঃ

আমি কোন একদিনের জন্য কেঁদেছি কিন্তু পরবর্তীতে
তারচেয়েও কষ্ট পেয়ে পূর্বের সেই দিনের জন্যই কাঁদতে হয়েছে।

অপর এক কবি বলেনঃ

আমি আমরের জন্য বদদু'আ করলে সে মারা যায়, এরপর আমি
অন্যদের দ্বারা নিগৃহীত হই, ফলে আমরের জন্যই পরে কান্নাকাটি করি।

১. বুখারী হাদীস নং ৩৫০, মুসলিম হাদীস নং ৩৩৬/৭০

চরমপন্থী দলগুলো অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে

সরকারগুলোই সর্বদা চরমপন্থী দল বা গ্রুপগুলোর উপর জয়লাভ করে থাকে, যদিও প্রাথমিকভাবে এরা কিছু কিছু সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারা বিভিন্ন দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ঃ

১. ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এসব যুবকরা নিহত হচ্ছে আর যে মারা যায় না তাকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে এবং দীর্ঘ মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত হয়। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। ছাত্র হলে তাদের অনেকেরই লেখাপড়া জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, চাকুরীজীবী হলে চাকুরী হারায়, ব্যবসায়ী হলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। আর এগুলো বাস্তবিকই বিরাট বড়ধরনের ক্ষতি, যা আমরা স্বচক্ষে দেখলাম। তাদের নিয়ত কি ছিল সেটা আল্লাহই ভাল জানেন, তাদের ব্যাপারে তিনি কি করবেন। কিন্তু দুনিয়ার হিসেবে তাদের কর্ম নিস্ফল, ক্ষতি অপূরণীয়।

২. দেশে-বিদেশে ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে ক্ষতি। চরমপন্থাকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী জাগরণকে কলুষিত করা হচ্ছে, ইসলামকে কলঙ্কিত করা হচ্ছে এবং ইসলাম বিশ্বের শান্তি-নিরাপত্তার জন্য হুমকী স্বরূপ বলে ইসলামের শত্রুরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী ও হিংস্র বলে আখ্যায়িত করার প্রয়াসে লিপ্ত। তাদের মনে কোন দয়া-মায়া নেই বলে প্রচার করছে বিশেষ করে মিসর ও আলজিরিয়ায় কতিপয় রক্তাক্ত ঘটনাবলী ঘটে যাওয়ার পর যা দেখে যে কোন মানুষই ব্যথিত না হয়ে পারে না।

৩. ইসলাম বিদ্বেষীদের হাতে ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার সুযোগ করে দেওয়া। এসব ঘটনাকে পুঁজি করে ইসলামের দুশমনরা সঠিক ইসলামী আন্দোলন ও জাগরণকে নিগৃহীত করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে, তারা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

৪. জাতীয় পর্যায়ে ক্ষতি– একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে পড়ছে, দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির কোন খবর নেই, জনগণের সমস্যার কথা বাদ দিয়ে কে কাকে মারবে এই চিন্তায় বিভোর। দেশের সমস্যার সমাধানে যেখানে একে অপরের হাতে হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া দরকার সেখানে একে অপরকে মারতে হত্যা করতে তৎপর রয়েছে।

মিসরের জামাআ ইসলামিয়ার আলোকিত প্রত্যাবর্তন

আমরা এখানে অত্যন্ত গৌরবের সাথে উল্লেখ করতে চাই যা মিসরের জামাআ ইসলামিয়া ঘোষণা করেছে এবং সেটিকে তাদের আধ্যাত্মিক নেতা শায়খ উমর আব্দুর রহমান সমর্থন করেছেন, যিনি এখন আমেরিকার কারাগারে বন্দী রয়েছেন- আল্লাহ তাঁকে মুক্তি দিন- তারা ঘোষণা করেছে চরমপন্থা বন্ধ করার এবং শান্তির পথ গ্রহণ করার আর সবধরনের সশস্ত্র প্রতিরোধ পরিত্যাগ করার। তারা তাদের জিহাদের নামে যেসব ভুল-ক্রটি সংঘঠিত হয়েছে তা তারা স্বীকার করেছে। তারা এটি করেছে ১৯৯৭ সালের ৫ই জুলাই কোর্টের নিকট। সামরিক আদালতে ২৩৫ নং মামলায় উপস্থিত সকলেই হতবাক হয়ে গেলেন যখন জামাআ ইসলামিয়ার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের স্বাক্ষর করা বিবৃতি পাঠ করে শুনানো হল প্রিন্টিং মিডিয়া ও স্যাটেলাইট চ্যানেলের লোকজনের উপস্থিতিতে যে, তারা সবধরনের রক্তপাত ও সশস্ত্র আক্রমণ পরিত্যাগ করছে।

জামাআ ইসলামিয়ার কতিপয় নেতা এটির সত্যতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। পরে তারা নিশ্চিত হতে পারেন যে ঘটনা সত্য, তারা সমঝোতা ও শান্তির পথ গ্রহণ করেছেন। এরপর তারা ১৯৯৯ সালের ২৮ মার্চ ঘোষণা করে সম্পূর্ণভাবে চরমপন্থা পরিত্যাগ করার এবং সবধরনের আক্রমণ ত্যাগ করার আর তারা এ ব্যাপারে বিবৃতিও প্রকাশ করে।

এরপর জামাআ ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দ বেশ কিছু বিবৃতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবতার নিরিখে প্রকাশ করেন যাতে তারা তাদের এই পদক্ষেপ ও অবস্থানের ব্যাপারটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ও ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেম-উলামাদের দলিল-প্রমাণসহ

বেশকিছু বিবৃতি প্রকাশ করেন যা তারা "তাসহীহুল মাফাহীম" [বুঝ-সমঝ পরিশুদ্ধকরণ] নামে প্রকাশ করেন। এসব বিবৃতির প্রকাশক বলেন, এগুলো হল শান্তি আলোচনার বিশেষ ফলশ্রুতি। এর দ্বারা নেতৃবৃন্দ চেয়েছেন তাদের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে লোকজনকে অবহিত করতে এবং ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে বিশেষ করে ইসলামী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে।

তিনি আরো বলেন, এসব বিবৃতির আরেকটি বিশেষ দিক হল, শীর্ষস্থানীয় সকল নেতৃবৃন্দ এটি দেখেছেন এবং পড়েছেন যেমনঃ কারাম জুহদী, নাজেহ ইবরাহীম, উসামা হাফেজ, ফুয়াদ দুআলিমী, হামদী আব্দুর রহমান, আলী শারীফ, আসেম আব্দুল মাজেদ এবং এসাম দারবালা।

এসব বিবৃতি ও প্রচারণা আমার দৃষ্টি কেড়েছে এ জন্য যে, তাদের নিকট আমার বই-পুস্তক ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু আমি দেখলাম বিভিন্ন জায়গাতে তারা আমার বই-পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় তারা মুখলেস বা একনিষ্ঠ ছিল এবং তারা তাদের পূর্বের গোঁড়ামী থেকে বের হয়ে এসেছে। তারা অন্ধ অনুসরণ ও বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করেছে আর এটি তাদের সঠিক পথে ফিরে আসারই প্রমাণ বহন করে এবং সঠিক জ্ঞান ও হিকমতের অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ বুঝায়।

সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে দশটি শরয়ী বাধা

এসব ভাইয়েরা বুঝতে পেরেছে যে, সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা বা সশস্ত্র জিহাদ করা যাকে তারা শরীয়তে ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করত, এটি আজ তাদের উপর ওয়াজিব নয়। এর কারণ এ ব্যাপারে অনেকগুলো বাধা রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো দশটি। তাদের প্রথম বুকলেট "চরমপন্থা পরিহার করার পদক্ষেপঃ বাস্তবতা ও শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গী"-এ তারা এ ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ সহ উল্লেখ করে যা এখানে উল্লেখ করা হল।

১. প্রথম বাধাঃ এধারণাই প্রবল হচ্ছে যে, জিহাদ বা সশস্ত্র লড়াই বা সংঘাত দ্বারা কাঙ্খিত ফললাভ সম্ভবপর হবে না, যে উদ্দেশ্যে এই জিহাদ শুরু করা হয়েছিল।

২. দ্বিতীয় বাধাঃ সশস্ত্র লড়াই করা [মহান আল্লাহর] সৃষ্টির উদ্দেশ্য-লক্ষের পরিপন্থী। (এবং তা ঘৃণিতও বটে।)

৩. তৃতীয় বাধাঃ অপারগতা বা সামর্থ্যহীনতা। আর অপারগতার কারণে ওয়াজিবাত বা কর্তব্য তিরোহিত হয়ে যায়। "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যতটুকু সম্ভব।" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)

৪. চতুর্থ বাধাঃ ধ্বংস (জীবনাবশান) যেমনটি মহান আল্লাহ্ বলেনঃ " তোমরা তোমাদের হস্তদ্বয়কে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।" (সূরা বাকারা ঃ ১০৫)

৫. পঞ্চম বাধাঃ মুশরিকদের সাথে মুসলমানের উপস্থিতি। একজন মুসলমানের রক্তের জিম্মাদারীর কারণে সে যদি অন্যান্য মুশরিকের মাঝে রয়ে যায় যাতে তাকে পার্থক্য করা সম্ভব না হয় তাহলে সকলের রক্তই নিরাপদ হয়ে যাবে। তাদেরকে আক্রমণ করা যাবে না, মুসলিমের উপস্থিতির কারণে। এ ব্যাপারে কুরআন বলেঃ

وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ ج لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ (الفتح : ٢٥)

"যদি মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা না থাকত, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না যে, অজ্ঞাতসারে তাদেরকে পদদলিত করবে, ফলে তাদের কারণে তোমরা দোষী হতে কিন্তু আমি তাদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছি যাতে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন। যদি তারা পৃথক থাকত, তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে আমি অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।" (সূরা ফাতহ ঃ ২৫)

৬. ষষ্ঠ বাধাঃ কাফেররাও কালেমা শাহাদাত পাঠ করছে, মুরতাদ ব্যক্তিও তাওবা করতে পারে এবং সঠিক ইসলামের পথে ফিরে আসছে এবং গুনাহগার-পাপী আল্লাহর আনুগত্যে ফিরে আসছে।

৭. সপ্তম বাধাঃ যদি লড়াই-সংগাম করতে গিয়ে যে ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে বলে আশংকা করা হয়, সম্ভাব্য ফল লাভের চেয়ে অথবা এর দ্বারা ভালোর চেয়ে মন্দই বেশী হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

৮. অষ্টম বাধাঃ বিশেষ করে আহলে কিতাবদের (ইহুদী-খৃষ্টানদের) ব্যাপারে– যদি তারা নির্ধারিত ট্যাক্স (জিযিয়া) বা অন্য কর সরকারের নিকট প্রদান করে থাকে আর তাদের জন্য সরকার নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যায় না। তারা যেহেতু মুসলমানদের দেশে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রবেশ করছে, তাহলে তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে হবে, তাদেরকে হত্যা করা যাবে না বা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না।

৯. নবম বাধাঃ সকলের নিকট দাওয়াত না পৌঁছা। কারণ, কারো নিকট ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছার পূর্বে তার সাথে লড়াই করা জায়েয নয়।

১০. দশম বাধাঃ সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করা। আর একথা সুবিদিত যে, সন্ধিই উত্তম। শায়খ হাসকাফী তাঁর দুররুল মুখতার [তানভীরুল আবসার গ্রন্থের ব্যাখ্যা] গ্রন্থে বলেন, তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করা জায়েয তাদের পক্ষ থেকে ধন-সম্পদ দিয়ে অথবা আমাদের পক্ষ থেকে ধন-সম্পদ প্রদান করে, যদি এতে কল্যাণ থাকে মহান আল্লাহর এ বাণীর কারণেঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا - (الأنفال : ٦١)

"আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়।" (সূরা আনফাল ঃ ৬১) ইমাম ইবনে আবেদীন এর টীকায় লিখেন, "আয়াতের হুকুমকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে কল্যাণলাভ থাকার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে, এটি সম্মিলিত অভিমত [ইজমা]।"[১]

---

১. বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে "ফিকহুল জিহাদ" গ্রন্থটি পাঠ করুন, যা অচিরের প্রকাশিত হবে।

এই চুক্তি যখনই সম্পাদিত হবে তখনই লড়াই করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, সে চুক্তি সাময়িক হোক বা স্থায়ী।

এ দশটি বাধার কথা যা এখানে উল্লেখ করলাম, সেগুলো তাদের প্রথম বুকলেট "চরমপন্থা পরিহার করার পদক্ষেপঃ বাস্তবতা ও শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গী" থেকে সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। তারা সেখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে। তাদের সে বুকলেটের শেষভাগে এই বলিষ্ঠ বক্তব্য তুলে ধরেছে যা আমি এখানে উল্লেখ করছিঃ

তারা বলেঃ "আমরা ইসলামী আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমাদের উপর ওয়াজিব হল- আমাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য স্পষ্ট হতে হবে যেজন্য আমরা কাজ করছি এবং অবশ্যই আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে মুল্যায়ন করতে হবে যে, এই পদক্ষেপ আমাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে কি না। আমাদের মহান উদ্দেশ্যই হল যা নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেনঃ "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই।" (সূরা মুমিনুন ঃ ৩২)

আমাদের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে তাদের রব এর ইবাদতের বন্ধনে একীভূত করা অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকুলের নিকট হেদায়েতের বাণী উপস্থাপন করা। এজন্য আমাদেরকে পর্যাপ্ত সাহসের সাথে অগ্রসর হতে হবে যেকোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যাকে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক মনে করব।

আমাদেরকে আরো সাহসের সাথে অগ্রসর হতে হবে যেন আমরা আমাদের গৃহীত পদক্ষেপ যা আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক নয় যদিও বাস্তবে সেটি কেউ কেউ আমাদের ইতোমধ্যে বাস্তবে করে ফেলেছে তা পরিহার করতে হবে- যা আমাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য মানুষকে হেদায়েতের পথে আহ্বান করা- এতে প্রতিবন্ধক কর্মকাণ্ড অবশ্যই সাহসের সাথে পরিহার করব। এটি কোন বাহাদুরী নয় যে, আমরা আমাদের দেশের

সন্তানদেরকে হত্যা করব। আমরা এটা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি যে, আমরা করো হাড়-হাড্ডি ভাঙ্গতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে দীনের দাওয়াতকেই ধ্বংস করে দিলাম।

বরং সাহস ও বাহাদুরীর কাজ হল যা রাসূলুল্লাহ (সা.) করেছেন যখন তিনি দেখলেন কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ পরিত্যাগ করা উত্তম, তখন তিনি তাদের সাথে সন্ধি করেন [সন্ধি চুক্তিতে কুরাইশদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু কঠোর ও অসম্মানজনক শর্তারোপ করা হয়েছিল]। এমনকি উমর (রা.) বলেন, আমরা কেন দীনের ব্যাপারে এত কঠিন শর্ত মেনে নিচ্ছি?"[১]

রাসূল (সা.) আরো সাহস ও বাহাদুরীর উদাহরণ হল- তিনি যখন জানলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কৌশলে মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে মুতা'র যুদ্ধ থেকে পিছু হটে এসেছেন। তিনি সেটিকে মেনে নিয়েছেন। অথচ অনেক মুসলমানই এটিকে মেনে নিতে না পেরে তাঁকে পলাতক বলে অভিযুক্ত করেন।

রাসূল (সা.) এর শিক্ষা ও অনুমোদন ভালভাবে অধ্যয়ন-পর্যবেক্ষণ করে আমরা মিসরে সশস্ত্র লড়াই পরিত্যাগ করার ঘোষণা প্রদান করছি।"[২]

আমার দৃঢ়বিশ্বাস মিসরের জামাআ ইসলামিয়ার বর্তমান অবস্থান এবং তাদের পূর্বচিন্তাধারা থেকে প্রত্যাবর্তন করা নিঃসন্দেহে এক বলিষ্ঠ সাহসী পদক্ষেপ। আর তাদের বক্তব্যগুলো পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করায় তাদের নিয়তের একনিষ্ঠতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় থাকে না। এর দ্বারা তাদের চিন্তাধারাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যারা শুধুমাত্র নিরাপত্তামূলক

---

১. বুখারী হাদীস নং ৩০১০, মুসলিম ১৭৮৫/৯৪ সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) থেকে বর্ণিত।

২. দেখুন, জামাআ ইসলামিয়ার প্রকাশিত বুকলেট "চরমপন্থা পরিহার করার পদক্ষেপঃ বাস্তবতা ও শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গী", এবং তাদের অপর প্রকাশিত পুস্তিকা- "জিহাদের কি ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তার উপর দৃষ্টিপাত"।

পদক্ষেপ গ্রহণকেই একমাত্র পথ বলে মনে করত। নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ ও কর্মসূচী দ্বারা তাদেরকে সাময়িকভাবে দমন করা সম্ভব হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও চিন্তার জগতে তাদের যে ভ্রান্তি রয়েছে তা দূর করা সম্ভব হবে না। সুযোগ পেলেই বিভ্রান্তরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। হয়তবা নতুন কোন নামে বা আঙ্গিকে তারা সংগঠিত হবে। এজন্য তাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন এনে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় সমস্যার সমাধান হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

সমাপ্ত

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স-এর প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি বইঃ

- গুনাহ্
- নবীজীর কথা
- ঈমানী দুর্বলতা
- ফিকহ্ মুহাম্মদী
- নামাযের অন্তরালে
- তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ
- ইসলামে ইবাদতের পরিধি
- মুসলমানকে যা জানতেই হবে
- আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু?
- আদর্শ পরিবার গড়ার শত টিপস
- আল-কুরআনের অভিনব অভিধান
- বিশ্ববরেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামায়াত
- ইসলামের দৃষ্টিতে কাঙ্খিত পরিবার
- সূরাতুল ফাতিহা একটি আবেদন
- পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম
- ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব
- মাখলুকাত ও রাবুবিয়াত
- মাসায়েলে হজ্ব ও উমরা
- ঈমান এক জীবন্ত শক্তি
- কিয়ামতের আলামত
- বিশ্বনবীর আবির্ভাবে
- প্রেম যোগ জ্ঞান

ইসলাম ও চরমপন্থা

আমি এখানে চরমপন্থা সম্পর্কে কিছু লেখা উপস্থাপন করছি এবং এ সম্পর্কে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থান তুলে ধরছি। বিষয়টি আজ সবার নিকট বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, বিষয়টি নিয়ে গোটা দুনিয়াতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। এর দ্বারা শুধু মুসলমানদেরকেই অভিযুক্ত করা হয়নি বরং ইসলামকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। প্রায়ই বলা হচ্ছে- ইসলাম এমন এক ধর্ম যার চিন্তাধারা ও কর্মে চরমপন্থা লালন করা হয়ে থাকে- আল্লাহর ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু করে, তাঁর উপর দৃঢ়বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে তিনি (আল্লাহ) হলেন অদ্বিতীয়, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, মহাক্ষমতাধর; ইসলাম তার অনুসারীদের উপর জিহাদ ফরয করেছে যেন তারা আল্লাহর পথে যথার্থভাবে জিহাদ করে।

আমি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে চেয়েছি তাদের জন্য যারা এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল নয় এবং যারা অবগত তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আর যত অপবাদ দেয়া হয়েছে তার জবাব দিতে চেয়েছি এবং এই মহান দ্বীন সম্পর্কে যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা হচ্ছে তা অপনোদন করতে চেয়েছি, যাকে এর কিছু নির্বোধ অনুসারী কলুষিত করেছে তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে। প্রাচীন কালের প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে- 'জ্ঞানী শত্রু বোকা বন্ধুর চেয়ে উত্তম!'

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ০৩৭৭২০১৬২৯২, ০১৭১৪০১৫৯৭৭, ০১৬৭২৬৯২১০০